আনন্দমেলা

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশন

২/-

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

বিশেষ আকর্ষণ

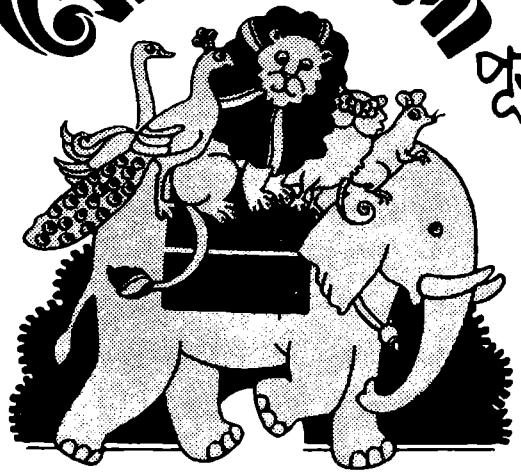

অবনীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত রচনা

শিশিরকুমার বসুর
আমরা নেতাজীর ক্যাডেট

শমীর চিঠি
কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

ছড়া
অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মৌমাছি, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুনীল রায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

গল্প
মনোজ বসু, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অরবিন্দ গুহ, অরুণ বাগচী, নবনীতা দেবসেন, তারাপদ রায়, হিমানীশ গোস্বামী, বলরাম বসাক, শেখর বসু ও আরও অনেকে।

ভ্রমণকাহিনী, ধাঁধা, শব্দসন্ধান ও আরও অনেক আকর্ষণ

উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়ের
(সুবিশাল শঙ্কু-কাহিনী)
আশাপূর্ণা দেবী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

বড় গল্প

বিমল মিত্র
বিমল কর
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ফটো টাইপ সেটিং পদ্ধতিতে অফসেটে ছাপা, অনবদ্য লেখায় ঠাসা পূজাবার্ষিকী

গোয়েন্দা রিপের সুবিশাল চিত্রকাহিনী "হারানো মেয়ে"

দাম ১৬.০০ টাকা
রেজিস্ট্রীডাকে ১৮.৯০

AAM/CAS-2/81 BEN

আনন্দমেলা

৬ আশ্বিন ১৩৮৮ • ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১২ সংখ্যা

ভ্রমণকাহিনী

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মিউনিখ । পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায় ৪

উপন্যাস

সিসের আঙটি । বিমল কর ২১
হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫৫

গল্প

গয়নার বাকসো । শেখর বসু ১০
তোতাকাহিনী । আরতি দাস ৩৬

ছড়া ও কবিতা

বেলুন-গাড়ি । সুরজিৎ ঘোষ ১৯
শব্দ ধরে ধরে । সিদ্ধেশ্বর সেন ২৭
ছটফটে এক মাছি । গোবিন্দপ্রসাদ বসু ২৭
কালকা মেলে কালীদা । রঞ্জন ভাদুড়ী ২৮

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৭

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । পি. কে. ৫১

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২, টারজান ৬০
গাবলু ৬১, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া

বাংলা বলো ৬২, সহজে ইংরেজি ৬৩

খেলাধুলা

সাদা-কালোর লাল দিন । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৩
মাইক ব্রিয়ারলি । রাজু মুখোপাধ্যায় ৪৫
উজ্জ্বল বয়কট । মণীশ মৌলিক ৪৯

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২৫, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬
ভাস্কর গাঙ্গুলির পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪১

প্রচ্ছদ : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাদপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা !

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।
সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল
পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

HTB-BCL-3641

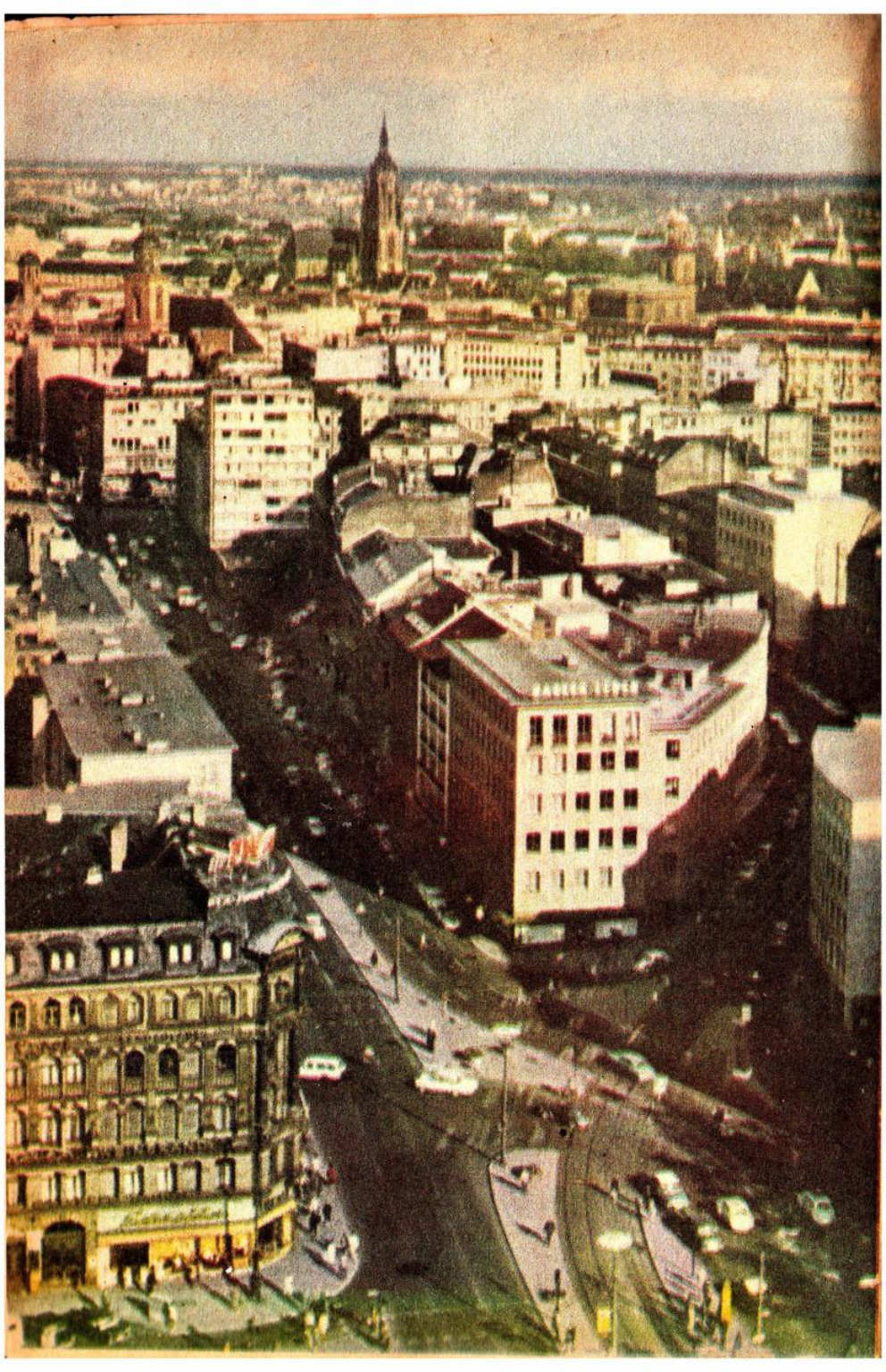

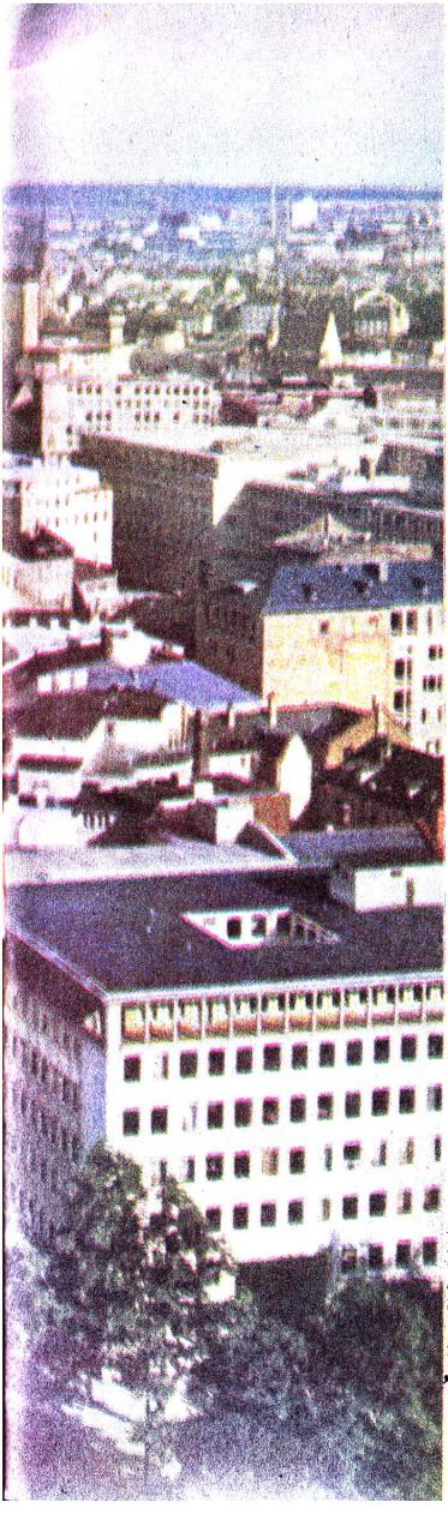

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে মিউনিখ

পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমান-বন্দর থেকে বাইরে বেরিয়েই তো আমরা অবাক। এই নাকি সেই শহর যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। জার্মানির বিখ্যাত মেইন নদী এই শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। শহরের সর্বত্রই এখন চোখে পড়ে বহুতলবিশিষ্ট উঁচু-উঁচু অফিস-বাড়ি। ফ্রাঙ্কফুর্ট এখন জার্মানির ব্যস্ততম বিমান-বন্দর। শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক অতি চমৎকার। মহাযুদ্ধে ধ্বংস হওয়ার আগে শহরে অনেক এলোমেলো কাঠের বাড়ি ছিল। পুরনো দিনের সাক্ষ্য দিতে রোমার্ড স্কোয়ারে পুরনো ধাঁচের কিছু বাড়ি রেখে দেওয়া হয়েছে। মহাকবি গ্যেটে যে-বাড়িতে ছিলেন, সে-বাড়িও সযত্নে রক্ষিত। পৃথিবীর অন্যতম বিরাট সংবাদপত্রের অফিসও এই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে। সংবাদপত্রের নাম Frankfurter Allgemeine Zeitung।

এখানে যে-কাজে এসেছি সেই কাজের সূত্রেই যেতে হবে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্রায় ৬০০ কিমি দক্ষিণের একটি শহরে—বলতে গেলে পশ্চিম জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সীমান্তে, নাম উঙ্করান্টহাউস্গেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে এই শহরে যেতে হবে ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাজধানী এবং পশ্চিম জার্মানির তৃতীয় বৃহত্তম শহর মিউনিখের মধ্যে দিয়ে। ঐ শহরটাও ব্যাভেরিয়া রাজ্যের মধ্যেই।

তারিখটা ৪ঠা জুন ১৯৮১। আমার সঙ্গে আছেন পাক্ষিক আনন্দমেলার সম্পাদক। আর আছেন অধুনা পশ্চিম জার্মানির বাসিন্দা আমাদেরই কলকাতার ছেলে শ্যাম শীল। শ্যামের মস্ত বড় ভক্সওয়াগন গাড়িতে আমরা আরোহী। চালকের আসনে শ্যাম। পথঘাট তাঁর সব জলের মতো মুখস্থ। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁর আধুনিক মাঝারি ধরনের ছাপাখানা আছে। নাম 'শীল ড্রাক'। জার্মান ভাষায় উচ্চারণ 'জীল ড্রুক'। ঐ জীল ড্রুক সাইনবোর্ড লাগানো

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লাখ লাখ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল... নিরাপদ আর সুবিবেচনক ওষুধ—যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

কি ক'রে দেখুন॥

- প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যে ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
- ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
- ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে অতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কা করতে সাহায্য করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠ
স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনে
প্রতিপদে মনে হবে

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM 2115 R BN

গাড়িতে চেপে 'হওপটভানহোপ' অর্থাৎ মেন রেলওয়ে স্টেশনের গা ঘেঁষে 'মানচেনার স্ট্রাসে' অর্থাৎ মিউনিখ যাবার রাস্তা ধরে আমাদের দীর্ঘ মোটর-যাত্রা শুরু হল। সময় তখন বিকেল ৪টে। ঘণ্টায় ১২০ কিমি ছুটলে পৌঁছুতে রাত ৯টার উপর বাজবে। কিন্তু অঙ্কের হিসেব আর বাস্তব হিসেব সব সময় মেলে না। আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম ৪ঠা জুন রাত ৯-১০ মিনিটের পরিবর্তে ৫ই জুন বেলা ১০টা নাগাদ। হিসেবের এত গরমিল কেন? বলছি।

গাড়ি বরাবরই ছুটেছে 'অটোবান' অর্থাৎ হাইওয়ে ধরে। জার্মান ভাষায় হাইওয়েকে বলা হয় অটোবান। এই অটোবান যুদ্ধের আগেই তৈরি হয়েছিল। এই রাস্তা ধরে যাতায়াত করলে জার্মানির প্রতি শহরে গ্রামে গঞ্জে পৌঁছনো যায়। বিশ্বযুদ্ধে এই রাস্তা আটক হয়েছিল। ফলে বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে লোকে যে এদিক-ওদিক পালাবে সে-সুযোগও ছিল না। হাজার-হাজার লোক নিজের শহরে নিজের গ্রামে আটকা পড়ে বোমার ঘায়ে মারা যায়।

ইউরোপের বেশিরভাগ শহরেই রাস্তাঘাট সুন্দর ঝকঝকে তকতকে। কিন্তু অটোবানের পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য তুলনারহিত। তার সঙ্গে দু'পাশের অপরূপ নিসর্গদৃশ্যের বর্ণনা কবি-সাহিত্যিক হলে দিতে পারতাম। কখনও চোখে পড়ল ডাকবাংলো, কখনও সার্কিট হাউস, কখনও পঞ্চাশ-ষাট ঘর বসতি আছে এমন ছোট-ছোট গ্রাম। গ্রাম অবশ্য শহরের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয়। প্রতিটি বাড়ির মাথায় টিভি অ্যানটেনা। প্রতিটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোটরগাড়ি। বাড়িগুলো বেশিরভাগই দোতলা। তাদের মধ্যমণি হয়ে আছে এক-একটি গির্জা। গির্জাগুলির মাথায় সুদৃশ্য গোল গম্বুজ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, গ্রামবাসীরা নিয়মিত চার্চে যায়।

শ্যাম সাবলীল ভঙ্গিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, কোনো ক্লান্তি নেই। ঘণ্টায় ১২০ কিমি বেগে গাড়ি চালাতে-চালাতে নানা ধরনের গল্পও করছেন। এদিকে আমরা ঘুমে ঢুলুঢুলু। মসৃণ পথে গাড়ির অত গতি, তার উপর গত কদিনের পথের ধকল, কাজের ক্লান্তি—ঘুমের আর দোষ কী! কত কী যে দেখিনি তার হিসেব নেই। সারি-সারি গাড়ি ছুটছে। কোনো গাড়ির গতি ৮০ কিমির নীচে নামে না, গতিবেগ কমালে বা আগে থেকে সূচনা না দিয়ে 'লেন' পরিবর্তন করলে দুর্ঘটনা অনিবার্য।

দশ-পনরো কিমি অন্তর-অন্তর বড়-বড় সাইনবোর্ডে দিকচিহ্ন হিসেবে 'আউসফার্ট' কথাটা লেখা রয়েছে। তার মানে কোনো ছোট শহর বা গ্রামে ঢোকার বা বেরোবার পথ। মূল অটোবান থেকে ডাইনে না বাঁয়ে যেতে হবে তার নির্দেশ আছে।

একটা গ্যাসোলিন পাম্পের লাগোয়া এক রেস্তোরাঁয় থামলাম আমরা। উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ কফিপান। গ্যাসোলিন মানে পেট্রোল। কফি খেয়ে আবার যাত্রা শুরু। একটা বিরাট গেটওয়ালা রাস্তা দিয়ে মিউনিখ শহরের মধ্যে আমাদের গাড়ি ঢুকল। ঘড়িতে প্রায় ৯টা। তখনও অন্ধকার নামেনি। এই সেই প্রসিদ্ধ শহর মিউনিখ—জার্মানরা যাকে 'মানচেন' বলে। নানা কারণে মিউনিখের প্রসিদ্ধি। তাছাড়া ১৯৭৫ সালে বিশ্ব-অলিম্পিক হওয়ায় মিউনিখ আরো বিখ্যাত হয়েছে।

অনেকবার শহরের মধ্যে ঘুরপাক খেলাম আমরা। মাঝারি ধরনের কোনো হোটেল পেলাম না। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। বড় হোটেলে উঠলে অনেক খরচা—এই ভয়ে আমরা স্থির করলাম গন্তব্যের দিকে যতটা পারব এগিয়ে যাব। নিশ্চয় কোনো হোটেল বা মোটেল নজরে পড়বে। মোটেল হচ্ছে মোটর রাখবার ব্যবস্থাসমেত হোটেল। রাস্তায় দিক ভুল হতে পারে, হোটেল বা মোটেল পেতে বহু কিলোমিটার যেতে হতে পারে—এই আশঙ্কায় আরও গ্যাসোলিন ভরে নেবার জন্য শ্যাম আমাদের দেখতে বললেন কোনো গ্যাসোলিন পাম্প নজরে পড়ে কিনা। আমরা দুজনে রাস্তার দুদিক দেখতে-দেখতে চললাম। অনেকক্ষণ পরে বাঁ দিকে একটা পাম্প নজরে পড়ল জার্মানিতে গাড়ি চলে রাস্তার ডান দিক ধরে। প্রায় ১০ কিমি ঘুরে ঐ পাম্পের নাগাল পাওয়া গেল। গ্যাসোলিন ভরে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চলা শুরু হল। রাস্তার সাইনবোর্ডে অনেকবার নুরেমবার্গ শহরে পৌঁছনোর দিক্‌নিশানা চোখে পড়ল। নুরেমবার্গের নাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেকেই শুনেছে। আমাদের যাবার রাস্তার উলটো দিকটা হল নুরেমবার্গ। নুরেমবার্গে নাৎসি-নেতাদের যুদ্ধ-অপরাধের বিচার হয়েছিল।

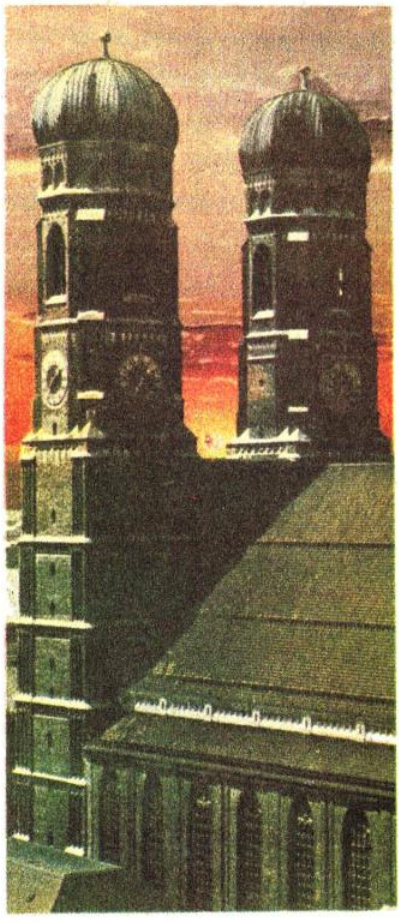

মিউনিখের স্থাপত্য

চলতে চলতে দূরে ঘরবাড়ির আলো নজরে পড়ল। ঐ আলো-বরাবর এগিয়ে আমরা সত্যিই একটা মোটেল দেখতে পেলাম। রাত ১১টা বেজে গেছে। খিদেয় প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘর পাওয়ার চিন্তায় ঘুম ততক্ষণে কোথায় পালিয়েছে। বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে শ্যাম যখন ঘর ঠিক করে ফিরলেন তখন মনে হল, আহ্, কী শান্তি! শ্যাম বললেন, খাবার পাওয়া যাবে, তবে ঠাণ্ডা। সম্পাদকমশায় জিদ ধরলেন, হয় তপ্ত খাব, নয় উপোস যাব। শ্যাম শেষ পর্যন্ত একটা ভাল **রেস্তোরাঁর** খোঁজ করে রাত ১২টার পর আমাদের সত্যিই অতি উপাদেয় গরম খাবার খাওয়ালেন। অত রাতেও যেন সন্ধেবেলার আমেজ। পথে নানাবয়সী নারীপুরুষের আনন্দোচ্ছল ভিড়।

মোটেলে ফিরতে রাত ১টা হল। তারপর আরামের বিছানায় গভীর ঘুম। স্বদেশের গ্রামের মতো পাখির কিচিরমিচির ডাকে ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল। সত্যিই, জার্মানির গাঁয়ে ভোর-দেখা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। যেদিকে তাকাই নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ। আমাদের দেশে গোরুরা মাতৃ-আখ্যা পায়, কিন্তু পেট পুরে খেতে পায় না। জার্মানির গোচারণভূমিতে নাদুসনুদুস গোরু দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মাঠের মধ্যে গোরুদের জল খাওয়ার জন্যে যে-ব্যবস্থা তাও দেখার মতন।

ব্রেকফাস্ট সেরে মোটেল থেকে বিদায় নিলাম। রওনা হলাম গন্তব্যের দিকে।

কাজ সারা হলে বেরিয়ে পড়লাম ট্রেনে চড়ে মিউনিখ শহর দেখতে। ফেরার তাগিদে শুধু যাওয়াই হল, খুঁটিয়ে দেখা হল না ভাল। আসতে-যেতে বিখ্যাত সিমেন্স ফ্যাক্টরি দেখা হল। পৃথিবীবিখ্যাত ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির কারখানা। ফেরার পথে ট্রেনের মধ্যে দুটি ছাত্রের সঙ্গে আমরা আলাপ জমালাম। দুজনের মধ্যে একজন ইহুদি। বোঝা গেল জার্মানিতে ইহুদিরা এখন ভালভাবেই আছে। ছেলে দুটি ক্লাস সেভেনে পড়ে। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ইংরেজি একটা বিষয় হিসেবে **অবশ্যক**। ক্লাস এইট থেকে আবার ফরাসি ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক। আমাদের সঙ্গে ছেলে দুটি মোটামুটি ইংরেজিতেই কথা বলল।

স্টেশনের কাছে শ্যাম গাড়ি রেখে **গিয়েছিলেন**। চট্‌জলদি টুকিটাকি কাজ সেরে ৪টের মধ্যে আবার ফ্রাঙ্কফুর্টের রাস্তা ধরা হল। পথে হিচহাইক-করা এক জার্মান যুবককে আমরা গাড়িতে তুলে নিলাম। হিচহাইক মানে **অন্যের গাড়ি থামিয়ে লিফ্‌ট নেওয়া**। কেউ-কেউ বা ভাষার অসুবিধে হবে বলে যেখানে যাবে সেই জায়গার নাম-লেখা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যুবকটি শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রশ্নোত্তরে ওদের জীবনযাত্রা ও সমস্যা সম্বন্ধে কিছুটা জানা গেল। ছেলেটি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ভক্ত মনে হল। নামল মিউনিখ টাওয়ারের কাছে। মিউনিখ টাওয়ার আমাদের শহিদ-মিনারের চেয়ে অন্তত তিনগুণ উঁচু—তৈরি হয়েছিল

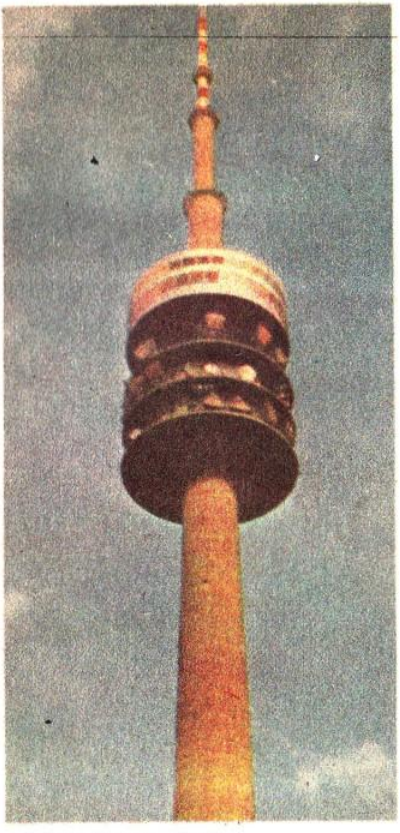

অলিম্পিক টাওয়ার, মিউনিখ

অলিম্পিক উপলক্ষে। না দেখলে বোঝা যাবে না, অলিম্পিক উপলক্ষে কত ঘরবাড়ি প্রাসাদ-ইমারত ইত্যাদি স্থায়ী স্থাপত্যসম্পদ এই শহরে তৈরি করা হয়েছিল। মিউনিখ শহর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ১৯৬০-এর মধ্যে আবার নতুন করে গড়ে ওঠে। অনেক দিক থেকে অটোবান এসে এই শহরে মিশেছে। পুরনো গথিক রীতিতে তৈরি এখানকার কিছু-কিছু গির্জা দেখবার মতো। নামী গির্জা 'ফ্রায়েনকাচ' (নির্মাণকাল ১৪৬৮ থেকে ১৪৮৮) যুদ্ধে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মেরামত করা হয়েছে। এই গির্জায় আছে দুটি উঁচু মিনার, তার উপরে তামার তৈরি গম্বুজ।

আগের দিন শহরটা ভাল দেখা হয়নি। শহর-পরিক্রমা সেরে আমরা আবার ধরলাম অটোবান। সঠিক সূচনা না দেওয়া আর গতি নিয়ন্ত্রণে না রাখার ফল দেখলাম আমাদের **উলটোদিকের** রাস্তায়। দুটি গাড়িতে বড় রকমের ধাক্কা। আমরা যখন জায়গাটা অতিক্রম করছি, দেখলাম কাছেই দুটি হেলিকপ্টারের মাথার পাখা ঘুরছে। মাইলের পর মাইল গাড়ি আটকে আছে। হেলিকপ্টারে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছেছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এত তৎপরতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। যাই হোক, আমাদের সুদক্ষ চালক গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে এলাম রাত ৯টায়।

অটো বানের ধারে

গয়নার বাকসো

শেখর বসু

কাকিমা এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজে চাপা গলায় বললেন, "আমার গয়নার বাকসো!" তারপর হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরে ছুটে গিয়ে স্টীলের আলমারির পাল্লা খুলে ফেললেন। আলমারি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও গয়নার বাকসো পাওয়া গেল না। কাকিমার গায়ের রঙ লালচে-ফর্সা, কিন্তু এখন একেবারে কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছিল। কাকিমা কাঁপা-কাঁপা গলায় আবার বললেন, "আমার গয়নার বাকসো!"

ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। বললাম, "পাচ্ছেন না?" কাকিমা আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কাঠের আলমারিটা খুলে ফেললেন এবার। স্টীলের আলমারিতে কাকিমা আস্তে আস্তে খুঁজছিলেন, এবার তাড়াতাড়ি। এত তাড়াতাড়ি যে এটা-সেটা পড়ে যাচ্ছিল মাঝেমধ্যে। আমি তুলে দিচ্ছিলাম, কিন্তু কাকিমা এদিকে নজরই দিচ্ছিলেন না। খোঁজা শেষ করে কাকিমা আরও ফ্যাকাশে হয়ে বললেন, "নেই! কী আশ্চর্য! গেল কোথায়?"

আমি বললাম, "কোথায় রেখেছিলেন, মনে নেই?"

কাকিমা এবারও আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। না দিয়ে টেবিলের ড্রয়ার, শো-কেস খোঁজার পরে বেশ চেঁচিয়ে বললেন, "আমার গয়নার বাকসো চুরি হয়ে গেছে!" কাকিমা কথাটা এত চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে এ-ঘরে সবাই চলে এল। বাড়ির লোক বলতে আমরা বাদে তিনজন কাজের লোক আর ছোটকাকা। কাকাবাবু এখন এখানে নেই,

অফিসের কাজে দিল্লি গেছেন।

ছোটকাকা সবে কলেজে ঢুকেছে। গম্ভীর হয়ে বলল, "অবাক কাণ্ড! গয়নার বাকসোটা তুমি ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসোনি তো?"

"না। বাকসোটা তো বছরখানেক হল বাড়িতেই আছে।"

"সে কী, অতগুলো গয়না তুমি বাড়িতেই রেখে দিয়েছ! ব্যাঙ্কের লকার রাখার মানে কী তাহলে? বাড়ির পাশেই ব্যাঙ্ক!"

কাকাবাবু চটে গেলে যেভাবে কথা বলেন, কথাগুলো ঠিক সেভাবেই বলল ছোটকাকা। কাকিমা রীতিমত ভেঙে পড়ে বললেন, "কী হবে এখন!"

ছোটকাকা আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "পুলিশে খবর দিতে হবে।"

"পুলিশ" শব্দটা কানে যেতেই আমি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা সত্যিই খুব গুরুতর। এদিক-ওদিক সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছোটকাকা বলল, "আচ্ছা, গয়নার বাকসোটা তুমি ঠিক কোথায় রেখেছিলে?"

কাকিমা থেমে-থেমে বললেন, "মনে হচ্ছে, বিছানার ওপর।"

ছোটকাকা একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে?"

কাকিমা এবার আমতা-আমতা করতে লাগলেন। "হ্যাঁ, মানে, বিছানারওপরেই তো, এই তো এখানেই।"

"গয়নার বাকসো খোলা জায়গায় ফেলে রাখো কেন?"

"ফেলে রাখিনি। এক-একবার মনে হচ্ছে, আলমারিতেই তুলে রেখেছিলাম।"

"চাবি দেওয়া ছিল আলমারিতে?"

"হ্যাঁ।"

"চাবি ছিল কোথায়?"

"আলমারির সঙ্গে লাগানোই ছিল।"

ছোটকাকা ঠিক কাকাবাবুর ভঙ্গিতে বলল, "তাহলে আর চাবি লাগানোর মানে কী?"

কথাটা বলার পরে ছোটকাকা চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবল, তারপর চোখ খুলে বলল, "আজ বাইরের লোক কে-কে এসেছিল

ক্লোজ-আপ তাজা নিঃশ্বাস, আর ক্লোজ-আপ সাদা দাঁতের জন্যে

স্বচ্ছ লাল

ক্লোজ-আপ

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

আপনি যখন সত্যিসত্যিই লোকের খুব কাছে থাকেন, আপনার চাই ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর আসল মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় ক্লোজ-আপ-তাজা, আর দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় ক্লোজ-আপ-সাদা!

কাছে, আরো কাছে পেতে—

ক্লোজ-আপ

এ-বাড়িতে ?"

কাকিমা এ-কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তখন ছোটকাকা নিজেই উত্তর খুঁজতে লেগে গেল। দেখা গেল, সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে এ-বাড়িতে এসেছে কাজের লোকদের একজন আত্মীয়, ছোটকাকার তিন বন্ধু, কাকিমার চেনাশোনা মিসেস সিন্‌হা আর আমার বন্ধু লালটু।

ছোটকাকা এবার সবার দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "এ-বাড়ির কাউকেই আমি ছাড়ব না। দরকার হলে এক-এক করে সার্চ করব সবাইকে।"

সার্চ করার কথা শুনে আমি সবার আড়ালে নিজের পকেটদুটো দেখে নিলাম একবার। বলা তো যায় না যদি ভুল করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। গয়নার বাকসো অবশ্য আমার এই ছোট্ট পকেটে ঢুকবে না, তবু...। আসলে পুলিশের কথা আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল সমানে।

সবাই মিলে সারা ঘর আর একবার তোলপাড় করে খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না গয়নার বাকসো। কাকিমার মুখ এখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো। সেদিকে তাকিয়ে ছোটকাকা বলল, "এক কাজ করলে হয় না। আমি একজন গুণীকে জানি। অল্প বয়েস, কিন্তু সত্যিই গুণী। বাটি চালিয়ে হারানো জিনিস খুঁজে দিতে পারে। না পারলে এক পয়সাও নেয় না। ডাকব ?"

কাকিমা একেবারে ভেঙে পড়ে বললেন, আমি আরকিছু ভাবতে পারছি না। যা পারিস কর্। তাড়াতাড়ি।"

"আচ্ছা বৌদি, গয়নাগুলোর দাম কত হবে ?"

"হাজার-পঞ্চাশ তো বটেই।"

মাথায় হাত দিয়ে ছোটকাকা বলল, "পঞ্চাশ হাজার ! তুমি তো তাও আবার পুরনো দিনের হিসেব বলছ। এখনকার হিসেবে ওই গয়নার দাম লাখ-দুয়েক তো হবেই।"

গয়নার দাম শুনে কাকিমা আঁতকে উঠলেন।

ছোটকাকা কাকিমাকে অভয় দিয়ে বলল, "একদম ঘাবড়িও না। দেখা যাক কী করতে পারি। প্রথমে নিজেরা চেষ্টা করব, না পারলে পুলিশ, পুলিশ না পারলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে খবর দেব।"

কাকিমা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,"তুই বাটি-চালা না কিসের কথা যেন বলছিলি ?"

"হ্যাঁ, এক্ষুনি খবর দিচ্ছি। মস্ত বড় গুণী। গয়না খুঁজে বার করতে না পারলে এক পয়সাও নেয় না। কিন্তু পেলে, একটু ভাল রকমের দক্ষিণা নেবে, এই ধরো হাজারখানেক টাকা।"

কাকিমার চোখে জল এসে গেছে প্রায়। কোনোরকমে বললেন, "দুলাখ টাকার জিনিস খুঁজে দেওয়ার জন্যে এক-দু হাজার কোনো টাকাই নয়। আমার মনে হয়, চোররা এতক্ষণ সব গয়না গালিয়েও ফেলেছে।"

"অসম্ভব নয়, আজকালকার চোররা অসম্ভব সেয়ানা। ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, গুণীকে পাই কিনা দেখি।"

ছোটকাকা প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

কাকিমার কষ্ট দেখে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, আমি যদি ক্লাস ফাইভের বদলে টেনে পড়তাম তাহলে হয়ত এই বিপদের দিনে কাকিমার পাশে দাঁড়াতে পারতাম অনায়াসে ! আমার আক্ষেপ আরও বাড়তে যাওয়ার মুখে ছোটকাকা বাটি-চালার কথা বলেছিল। বাটি-চালা আবার কী জিনিস ? জীবনে শুনিনি তো ! কাকিমাকে এই নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছিল না। কাকিমার যা মুখের চেহারা এখন !

ঘণ্টাখানেক বাদে ছোটকাকা ফিরে এল। সঙ্গে ছোটকাকাদের বয়সী আর একটি ছেলে। পরনে ধুতি, গায়ে চাদর। ঠিক এইরকম চেহারার পুরুতমশাই সরস্বতী পুজোর সময় দেখা যায় দু'চারজন। এই কি সেই গুণী ? এই কি বাটি চালায় ?

গুণীকে দেখে সারা বাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠল একসঙ্গে। তবে, কারও মুখে কোনও কথা নেই। কাকিমা অসম্ভব মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কী ভাবে খবরটা যেন ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। আশেপাশের বাড়ির দুচারজন কৌতূহলী মুখে দূরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছিল নিজেদের মধ্যে।

একটা ছোট মাপের কাঁসার বাটি মেঝের ওপর উপুড় করে রাখল গুণী। তারপর ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী রাশি ?"

এখন কিনুন! অধিক বাঁচান!

বাঁচান পুরো ২ টাকা

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

৫০০ গ্রামের রিফিল প্যাক কিনে

ঠিক তেমন-ই মজাদার,
তেমন-ই তাজা,
তেমন-ই স্বাদেভরা!

রিফিল প্যাক বিশেষভাবে সীল-করা হয়েছে যাতে বোর্নভিটা টাটকা থাকে। এটি খুলে ফেলুন, আর আপনার বোর্নভিটা-র খালি টিনের মধ্যে সবটা ঢেলে রাখুন...বোর্নভিটা-র স্বাভাবিক গুণটি পুরোপুরি বজায় থাকবে।

আপনার পরিবারকে দিন বোর্নভিটা—যার স্বাদ তাদের খুব পছন্দ! শীগগিরি! নিয়ে আসুন — আপনার বিশেষ লাভের ৫০০ গ্রামের রিফিল প্যাক। সেবন করুন—আপনার বোর্নভিটা।

শীগগিরি! স্টক সীমিত!

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

আপনাদের জন্যে গুণে ভরপুর

OBM 7043.BN

ছোটকাকা মৃদু গলায় কী যেন বলতেই গুণী বলল, "ঠিক আছে, আপনাকে দিয়ে চলবে। আপনি মেঝেয় বসে বাটির ওপর হাত দিন। আমি এখন মন্ত্র পড়ছি। মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে বাটি আপনাকে নিয়ে দৌড়বে। আপনি বাধা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। বাটি আপনাকে হারানো গয়নার কাছে নিয়ে যাবে। অবিশ্যি, গয়না যদি বাড়ির মধ্যে থাকে। গয়না বাড়ির বাইরে চলে গেলে আমার আর কিছু করার নেই।"

ছোটকাকা উবু হয়ে বসে বাটির ওপর হাত রাখতেই গুণী মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিল। কী-সব কঠিন-কঠিন মন্ত্র, শুধু অনুস্বার, চন্দ্রবিন্দু আর বিসর্গ। একটা শব্দেরও মানে বুঝতে পারছিলাম না আমি।

ছোটকাকা আর গুণীকে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ বাটি নড়ে উঠল। তারপর খুব জোরে ছুটে গেল কাকিমার শোবার ঘরের দিকে। বাটির ওপর ছোটকাকার হাত, ছোটকাকা হামাগুড়ি দিয়ে ছুটছিল বাটির পেছন-পেছন।

বাটি থমকে গেল শোবার ঘরের দরজায়। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে শাঁ করে ঘুরে ছুটল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাটির পেছন-পেছন আমরাও। ঘরের মাঝখানে কার্পেট পাতা, সেই কার্পেটের অর্ধেক উলটে দিল বাটি। তারপর পেডেস্টাল ল্যাম্পের পাশ দিয়ে ছুটে কোণের রঙিন মোড়াটাকে ধাক্কা মারল। ধাক্কা খেয়েই মোড়া উলটোল, আর মোড়া উলটোতেই বেরিয়ে পড়ল গয়নার বাকসো।

কাকিমা প্রায় ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে বাকসোটা তুলে ডালা খুলে ফেললেন। বাকসোর মধ্যে থরে-থরে সাজানো একগাদা গয়না। কাকিমার মুখে হাসি আর ধরে না। সব দেখেশুনে বললেন, "ঠিক আছে, কিচ্ছু খোয়া যায়নি।"

কাকিমা গুণীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "নগদ হাজার টাকা এখন তো বাড়িতে নেই। যা আছে দিচ্ছি, বাকিটা কাল দিয়ে দেব।"

গুণী সত্যিই গুণী, লাজুক মুখে বললেন, "ব্যস্ত হওয়ার কিচ্ছু নেই। আপনি আপনার সুবিধেমতো অসিতাভর হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।" অসিতাভ ছোটকাকার নাম।

গুণী চলে যাবার পরেও বাইরের ভিড় অনেকক্ষণ ছিল এ-বাড়িতে। মন্ত্রশক্তি নিয়ে নানান ধরনের গল্প হল। তারপর প্রশ্ন উঠল, কে চোর? বাড়ির কেউ, নাকি বাইরের? দিন-সাতেক এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হল, কিন্তু সন্দেহজনকরা সন্দেহজনকই থেকে গেল শেষ পর্যন্ত। চোর আর ধরা পড়ল না।

এই ক'দিনে বাটি-চালার আশ্চর্য ঘটনা আমি ডেকে-ডেকে সবাইকে শুনিয়েছি, কিন্তু কখনোই ভাবতে পারিনি, আমার জন্যে মস্ত একটা চমক অপেক্ষা করছে শিয়ালদা স্টেশনে।

আমি আর ব্রজদা স্টেশনে গিয়েছিলাম ছোটকাকাকে ট্রেনে তুলে দিতে। ছোটকাকা বন্ধুদের সঙ্গে দার্জিলিং যাবে। হঠাৎ দেখি ছোটকাকার তিন বন্ধুর মধ্যে সেই গুণী। গুণীর পরনে অবশ্য ধুতি-চাদরের বদলে প্যান্ট-শার্ট।

ছোটকাকাকে গুণীর কথা জিজ্ঞেস করতেই সে কী হাসি সবার। ব্রজদাও হাসছিল ওদের সঙ্গে। হাসতে হাসতে ছোটকাকা আমাকে বলল, "খবর্দার! এর কথা বাড়িতে কাউকে বলবি না। ফিরে এসে মজা হবে খুব।"

দার্জিলিং থেকে আটদিন বাদে ফিরে আসার পরে সত্যিই খুব মজা হয়েছিল বাড়িতে। মজার আসরে কাকাবাবুও ছিলেন। সব শুনে কাকাবাবু হাসতে হাসতে কাকিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব ভাল হয়েছে। তোমার একটা শিক্ষা হওয়ার দরকার ছিল। গয়নার বাকসো এখন থেকে আর যেখানে-সেখানে ফেলে রেখো না।"

সেই নকল গুণী ছোটকাকার কলেজের নতুন বন্ধু। নাম বরুণ, বরুণকাকা খুব মজা করতে পারে। একটু হেসে বলল, "না বৌদি, মাঝেমধ্যে এদিক-সেদিক ফেলে রাখবেন। না হলে আমাদের হাজার টাকাও জুটবে না, বেড়ানোও হবে না।"

কাকিমা চোখ পাকিয়ে বললেন, "বাঁদর কোথাকার! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

এবারের মজাটা আরও মজার। কাকিমা ট্রে ভর্তি করে রসগোল্লার পায়েস নিয়ে এলেন। আমরা সবাই পেট পুরে খেলাম।

ছবি : দেবাশিস দেব

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্‌টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.35-1810 BG

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩৫ ॥

১৯৪০-এর ডিসেম্বরে আমার জীবনে যা ঘটল তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। যে-ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, তার সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ব, সে-কথা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম? ইতিহাস নাকি আমাদের না জানিয়েই তার কাজ করে যায়। আমার মতো খড়কুটোও স্রোতের টানে দুর্বার গতিতে ভেসে চলে। পরে মনে হয় কোথায় যেন পৌঁছে গেলাম।

যাঁরা ইতিহাসপুরুষ তাঁরা যে কেবল বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সবকিছু ঠিক করেন তা নয়, ইনটুইশন বা স্বভাবজাত একটা অনুভূতি তাঁদের থাকে। রাঙাকাকাবাবু ঐ স্বভাবজাত অনুভূতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে, জগতের ইতিহাসে বড় বড় নেতারা অনেক সময়েই কেবল বুদ্ধির বিচারে নয়, ভিতর থেকে আসা অনুভূতির সাহায্যে অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে ঐসব সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বিচারে ঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। আমার মনে হয় রাঙাকাকাবাবুও কেবল বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারাও চালিত হতেন।

অনেকে আজও জিজ্ঞাসা করেন আমাকেই বা তিনি ডেকে নিলেন কেন। এর উত্তর দেওয়া শক্ত। কতটা সামগ্রিকভাবে বিচার করে বা কতটাই বা কেবল অনুভূতির ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তিবিশেষকে কাজের জন্য বেছে নিতেন কে জানে! হতে পারে, আমার অজান্তে অনেক দিন ধরে এর জন্য প্রস্তুতি চলছিল এবং সেজন্যই আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলাম। তবে প্রথমেই এটা বলে রাখি যে, একটা বিরাট ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের খুবই ছোট এবং অদৃশ্য যন্ত্র ছিলাম আমি।

বসুবাড়ির ছেলেমেয়েদের জীবন যে গতানুগতিক ছিল তা ঠিক বলা যায় না। দেশে তখন একটা সর্বাত্মক সংগ্রাম চলছে, আদর্শবাদের ঝড় সারা দেশটাকে তোলপাড় করছে। বাড়ির দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষ সেই সংগ্রামের অংশীদার। এ সব-কিছুর খানিকটা ছোঁয়া তো আমাদের গায়ে লাগবেই। ১৯৪০-এর আগেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নানাভাবে কমবেশি ছাত্র-আন্দোলন, যুব-আন্দোলন বা গণ-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাড়ির বাইরেও আমরা দেখতে পেতাম, দেশের হাজার হাজার লোক—নারী পুরুষ কিশোর ছাত্র—দেশের কাজে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। কত পরিবার নিঃস্ব হয়েছেন। কত ছেলেমেয়ে পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। জেলে গিয়েছেন। চোখের সামনেই তো কতজনকে প্রাণ বিসর্জন দিতেও দেখলাম। এসবের প্রভাব সামগ্রিকভাবে আমাদের ওপর পড়তে বাধ্য। তবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া যে একইরকম হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার সমসাময়িক অনেক ছাত্র ও যুবককে তো দেখেছি, নানা যুক্তি বা অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে জাতীয় সংগ্রামের স্রোত থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতেন।

যাই হোক, আমার জীবনের গতি সাধারণ অর্থে গতানুগতিক না হলেও সেই সময় পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি যেটা সত্যিই অসাধারণ বলা যায়। অসাধারণ বলতে আমি বলছি এমন একটা কিছু যেটা জীবনটাকে ওলটপালট করে দেয় এবং এক নতুন পথে চালিত করে। রাঙাকাকাবাবু তাঁর বিরাট পরিকল্পনায় একটা ছোট্ট কাজের ভার দিয়ে আমার জীবনে সেই অসাধারণত্ব এনে দিলেন।

ব্যাপারটার শুরু হল খুবই সহজভাবে। রাঙাকাকাবাবুর ব্যক্তিগত পরিচারক করুণা একটা ছুটির দিনে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমাকে বলে গে

শিশিরকুমার বসু (১৯৪১)

'কাকাবাবু' দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। বাড়ির কাউকে দিয়ে তো বলতে পারতেন বা টেলিফোনে ডাকতে পারতেন। আমার মা প্রায় রোজই রাঙাকাকাবাবুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। মা আমাকে ইতিমধ্যেই বলেছিলেন যে, রাঙাকাকাবাবু আমার দিনের রুটিন সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আমি কখন কলেজে যাই, কখন ফিরি, পড়াশুনার চাপ খুব বেশি কিনা। কলেজের পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ি কিনা, সপ্তাহের কোন্ দিনটা হালকা থাকে, ইত্যাদি। মাকে যখন এত কথাই আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছিলেন, মাকেই তো বলে দিতে পারতেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

আমি বেলা তিনটে নাগাদ এলগিন রোডের বাড়িতে হাজির হলাম। কেন তিনি আমাকে ডেকেছেন এ-বিষয়ে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল। আমাকে তিনি কী আর এমন কথা বলবেন! তবে তাঁর ঘরে ঢুকতেই মনে হল তিনি যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন, ঘরে আর কেউ নেই। স্নান-খাওয়া সেরে তাঁকে বেশ স্নিগ্ধ ও শান্ত দেখাচ্ছিল, যদিও একটু ফ্যাকাসে ও ক্লান্তির ভাবও ছিল। আমি তখনও পর্যন্ত বাবা বা রাঙাকাকাবাবুর সামনে একলা পড়ে গেলে একটু ঘাবড়ে যেতাম, কী জানি যদি কথাবার্তা চালাতে হয়। রাঙাকাকাবাবু যে আমাকে 'সাইলেন্ট বয়' নাম দিয়েছিলেন সেটা খুবই যথার্থ ছিল। দূর থেকে তাঁর সঙ্গে হাসি-বিনিময় এবং দু-একটা হ্যাঁ, না, পারি, পারি না, ভাল, মন্দ নয়, হতে পারে—এই ছিল বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে, বিশেষ করে রাঙাকাকাবাবু বা বাবার সঙ্গে আমার কথাবার্তার ধরন।

বালিশে ঠেসান দিয়ে তিনি খাটে বসে ছিলেন। পাশেই দাদাভাইয়ের পুরনো জমকালো খাট। অভ্যাসমতো আমি দাদাভাইয়ের খাটে বসলাম। তিনি ইশারা করে আমাকে ঘুরে আসতে বললেন এবং তাঁর খাটে তাঁর ডানদিকে হাত চাপড়ে বললেন, এসো, এখানে বোসো। আহ্বানটা ছিল খুবই সহজ ও অন্তরঙ্গ, হুকুম নয়। কিন্তু আমার নাড়ির গতি তো বেড়ে গেল। মুহূর্তের জন্য মনে হল, কী জানি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি নাকি, বকুনি-টকুনি কপালে নেই তো!

শান্ত ও সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে অল্প কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমিও শান্ত হয়ে গেলাম, নাড়ির গতি স্বাভাবিক হয়ে গেল। তাঁর চোখ ও চাহনি নিয়ে পরে কত কথাই না শুনেছি, ঐ চোখের টানে কত লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কত আমির ফকির হয়েছেন, কত সংসারী সর্বত্যাগী হয়েছেন।

বললেন, আমার একটা কাজ করতে পারবে?

তখন তো ভেবে দেখার সময় পাইনি। গত চল্লিশ বছর ধরে তো বারবার ঐ পাঁচটি কথা নিজেকে বারবার শুনিয়েছি। কত কথা যেন ঐ কয়টি কথার মধ্যে আছে। তাঁর কাজ আমি করব! তিনি নিশ্চয়ই এমন-কিছু আদেশ করবেন না যেটা আমার সাধ্যের বাইরে। তবে এ-প্রশ্ন কেন? কখনও কখনও মনে হয়েছে যেন একটা অনুরোধের সুর ঐ প্রশ্নের মধ্যে ছিল। আসলে কিন্তু তা নয়, আসলে ছিল প্রাণের

ডাক। এমন করে তো আগে তিনি কখনও আমাকে কিছু বলেননি। মনে আছে, বহুদিন আগে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে একদিন আমাকে একটা ছোট কাজ দিয়েছিলেন—কোথায় যেন গাড়ি পাঠাতে হবে। আমি ভাই-বোনেদের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত থাকায় কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের ঘরে এসে মুখ ভার করে বেশ জোর গলায় আমাকে বলেছিলেন, একটা কাজ বললাম করতে পারলে না! এই তো কদিন আগেই মুক্তির পরের দিন বিলেতে আমার এক দাদার কাছে একটা টেলিগ্রামের খসড়া করতে বললেন। একে আমার ইংরেজি জ্ঞান কম, তার উপর তাঁর যা বলার ইচ্ছা সেটা যদি আমার খসড়ায় প্রকাশ না পায়—এই ভেবে আমি গড়িমসি করছিলাম। খসড়া তৈরি হচ্ছে না দেখে আমাকে তো বেশ বকুনির সুরে বললেন, একটা টেলিগ্রামের খসড়াও করে উঠতে পারছ না! নিজের অক্ষমতায় আমি বেশ লজ্জা পেয়েছিলাম।

পরে বুঝেছিলাম যে, সেইদিন যে 'আমার একটা কাজ'-এর কথা তিনি বললেন সেটা সম্পূর্ণ এক নতুন অর্থে। একটা কাজের ভার দিয়ে নিয়তি সুভাষচন্দ্র বসুকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। কাজটা ছিল একান্তই তাঁর। তবে সেই কর্মযজ্ঞের চূড়ান্ত মুহূর্তে আমাদের মতো কয়েকটি সাধারণ মানুষকে তিনি ডেকে নিয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালে লাহোর ফোর্টে ইংরাজ সরকারের দুর্ধর্ষ অ্যাডিশনাল হোম সেক্রেটারি রিচার্ড টটেনহ্যাম আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, দেশত্যাগের প্রাক্কালে তোমার কাকার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠই ছিল, নয় কি? উত্তরে আমি বলেছিলাম, যে-কোনো ভারতীয় পরিবারে কাকা-ভাইপোর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই হয়ে থাকে। উত্তরটা ছিল ভুল। কী জানি কেন, ইংরেজ অফিসারটিরও উত্তরটি ঠিক মনঃপূত হয়নি। আসলে রাঙাকাকাবাবু ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে জীবনের জটিল যে-প্রান্তে পৌঁছেছিলেন সেখানে কাকা-ভাইপোর সম্পর্কটা হয়ে গিয়েছিল নিতান্তই গৌণ। শুরু হল এক নতুন সম্পর্ক, আত্মিক সহধর্মিতার সম্পর্ক। অতি সহজভাবে আমাকে যে-পথে তিনি ডাক দিলেন, সে-পথের শেষ যে আমি দেখব এমন কোনো প্রতিশ্রুতি সেদিন ছিল না। (ক্রমশ)

বেলুন গাড়ি

সুরজিৎ ঘোষ

তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা,
ডালহৌসি জ্যামজমাট
গাড়ির ভিড়ে যায় না দেখা
লালদিঘি কি রাস্তাঘাট
ট্যাক্সি মোটর হটর-হটর
চলবে জোরে সাধ্য কার?
মধ্যিখানে আটকে আমার
গরমছুটে দম সাবাড়।

এমন সময় আকাশ-পথে,
অবাক কাণ্ড বলব কী!
দেখতে পেলুম বেলুন চড়ে
যাচ্ছে উড়ে ঠিক-ঠিকই
পাশের বাড়ির নতুন জামাই,
কী যেন নাম, তরুণ বোস।
কেমন মজায় ফিরছে বাড়ি,
কোথায় রাখি এ-আফ্‌শোস।

বলল ডেকে উপর থেকে,
"শুনছেন কি সক্কলে।
এ-রাস্তাটাই সবচে সোজা
দেখে রাখুন চোখ খুলে।
মাটি ফুঁড়ে চক্র জুড়ে
যতই চালান রেলগাড়ি,
কলকাত্তায় সবার সেরা
বেলুন চেপে এই পাড়ি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

"বালী বালী, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে..."

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও সে বেঁচে যায়। আলাপ হয় রহস্যময় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি তোমার শত্রু নই।" প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি ওষুধ মেশাত তার খাবারে? ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রামের ফর্ম থাকে কেন? সিংহিবাবুই বা সেখানে যান কেন? সান্যালের বাড়ির কাছে শিশির ও বাবু যাকে দেখতে পায়, সে কি শত্রুপক্ষের চর? তারপর...

॥ ২২ ॥

স্টেশন ঘুরে শিশিররা এল বংশীর দোকানে। দোকান খোলা। বাতি জ্বলছিল। একাই ছিল বংশী।

শিশির আর বাবু দোকানে পা দিতেই বংশী চেঁচিয়ে উঠল, "আসুন বাবুদা। গিয়েছিলেন ওদিকে?"

বাবু জবাব দেবার আগেই শিশির বলল, "গিয়েছিলাম। ওখান থেকেই আসছি।"

দোকানের ভেতরে এসে দাঁড়াল শিশির। বংশীর দোকান ছোট হলেও কোথাও এলোমেলো ভাব নেই। খদ্দেরদের বসার জন্যে এক জোড়া টুল। ভেতরের দিকে চেয়ার। গায়ে গায়ে।

বাবুই আগে বসল। অনেকটা হাঁটা হয়েছে। পা ধরে গিয়েছিল।

শিশির বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ, বংশী। বাড়িটা যেন মিলিটারি-মার্কা। অত উঁচু পাঁচিল, তার ওপর কাঁটাতার। ওদিকে আবার এক টাওয়ার লাইট।"

বংশী বলল, "হ্যাঁ, মিস্টার সান্যাল চারদিক দেখে-শুনে থাকতে ভালবাসেন," বলে একটু হাসল। "যাক, তোমাদের অভিযানটা শুনি।"

শিশির বসল। বলল সব। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি তো ও-বাড়ির গাড়ির ড্রাইভারকে দেখেছ। ওই নুলো লোকটা নিশ্চয় গাড়ি চালায় না?"

মাথা নাড়ল বংশী। "ওদের গাড়ি চালায় বুড়োমতন একটা লোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল; চোখে চশমা।"

শিশির বাবুকে বলল, "দেখলে বাবুদা, আমি তোমায় আগেই বলেছি, ও-বেটা মিথ্যে কথা বলল।"

বাবু ঘাড় নাড়ল। কথাটা ঠিকই। বাবু বংশীর দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। রেল-লাইনের পাশ দিয়ে যে হাঁটাপথ সেই পথ দিয়ে কত লোকজন যায়, সব সময়েই। আমরা দুজন ওই রাস্তায় যাচ্ছি এটা কি নজরে পড়ার মতন ঘটনা! নিশ্চয় নয়। কেউ যদি আমাদের দিকে সব সময় চোখ রাখে, তবেই বুঝতে পারবে আমরা কোথায় যাচ্ছি, কী করছি। তাই না?"

শিশির বলল, "আমি তো তোমায় আগেই বলেছি, আমাদের ওপর ওদের সব সময় নজর আছে।"

বাবু বলল, "ওদের মানে কাদের? সিংহির না সান্যালের? যদি সিংহির নজর থাকে তাহলে সে সান্যালের ইনফরমার।"

বংশী বলল, "এটা আর নতুন কথা কী! আমি নিজের চোখেই তো দেখেছি।"

মাথা নাড়ল বাবু। বলল, "না, তুমি সিংহিবাবুকে সান্যালের বাড়িতে দেখেছ। একজনের বাড়িতে বাইরের কাউকে দেখলেই তাকে অতটা সন্দেহ করা কি ঠিক? হয়তো সিংহিবাবু কোনো কাজে সান্যালমশাইয়ের কাছে গিয়েছিলেন।"

"তা কেমন করে হয় বাবুদা?" বংশী বলল।

"হতে পারে না? ধরো, তুমিও যে সান্যালমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলে এটা যদি আমি দেখতাম, আমিও কি তোমায় ইনফরমার

ভাবতাম। সিংহিমশাই ও-বাড়িতে প্রায়ই যান কিনা, বা গেলেও সান্যালমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর কেমন সম্পর্ক এটা জানতে হবে।"

বংশী বলল, "সেটা জানা মুশকিল নয়। থানার হেমবাবুই জেনে দিতে পারবেন। তবে আমার কথা যদি বলেন, আমি সিংহিবাবুকে বিশ্বাস করি না। ভদ্রলোক শিশিরের প্রায় সব কথাই জানেন। কেন? এত কথা জানার উদ্দেশ্য কী তাঁর?"

বাবু চুপ করে গেল। সে যা শুনেছে শিশিরের মুখে তাতে অবশ্য সিংহিমশাইকে বিশ্বাস করার চেয়ে অবিশ্বাসই বেশি করতে হয়।

শিশির বলল, "বংশী, এবার একটু চা খাওয়া দরকার। অনেক হেঁটেছি।"

"বোসো, বলে আসছি।"

"কিছু নোনতাও দিতে বলো, খিদে পেয়ে গিয়েছে।"

বংশী দোকান ছেড়ে বাইরে গেল।

শিশির বলল, "বাবুদা, বংশী বোধহয় ঠিকই বলছে। সিংহিমশাইকে আমিও প্রায় বিশ্বাস করতে বসেছিলাম। কিন্তু এখন আর করি না।"

বাবু বলল, "আমি বিশ্বাস করতে বলছি না। আমি বলছিলাম, লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। ওর কাছ থেকে আমরা যদি কিছু জানতে পারি সেটা আমাদের লাভ। নয় কি! এই যে আজ আমরা বুঝতে পারছি—আঙটির ব্যাপারটা একেবারে বাজে, ধোঁকাবাজি—এটা তো সিংহিমশাইয়ের কথা থেকেই বোঝা গেল। সে-রকম যদি জানতে পারা যেত, কে তোর শত্রুতা করছে, কেন করছে—তাহলে আজ এত অন্ধকারে থাকতে হত না।"

শিশির কিছু বলল না। ভাবছিল।

বাবু অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। তারপর ধরাল।

এমন সময় দোকানে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এলেন। তিনি দোকানে পা দিয়ে শিশির আর বাবুকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন। যেন বংশী কোথাও লুকিয়ে আছে দেখছিলেন।

শিশির বলল, "বংশী চায়ের দোকানে গিয়েছে, আসছে। আপনি বসুন।"

ভদ্রলোক বসলেন না। চৌকাটের দিকে ফিরে গিয়ে বাইরের দিকটা দেখতে লাগলেন।

সামান্য পরেই বংশী এল।

ভদ্রলোক বললেন, "অভয়কে তুমি টাকা দিয়েছিলে; এই নাও তোমার রসিদ। টাউনের ওরা তোমার জিনিস এই হপ্তার শেষে পাঠিয়ে দেবে।"

রসিদ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, বংশী হঠাৎ বলল, "শিবুয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই চলত, আপনি কষ্ট করে কেন এলেন চ্যাটার্জিদা!"

"কষ্ট করে নয় হে, এদিকেই যাচ্ছি। একবার থানায় যাব।"

"থানায়?"

"আমাদের বাস একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে। থানায় একবার লিখিয়ে আসি।"

"কার গাড়ি? কোথায় অ্যাকসিডেন্ট হল?"

"মিস্টার সান্যালের গাড়ি। মাইলখানেক দূরে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সিরিয়াস কিছু নয়। ধাক্কা। সান্যাল গাড়িতে ছিলেন না; অন্য একজন ছিল, এদিককার লোক। দোষ ঠিক বাস ড্রাইভারের নয়। যাই, একবার বলে আসি থানায়। কম্পানির বাস। বুঝতেই তো পারছ।"

চ্যাটার্জিমশাই চলে গেলেন।

শিশির বলল, "বাস সার্ভিসের ম্যানেজার না?"

"হ্যাঁ, চ্যাটার্জিদা। ভীষণ ভাল লোক।"

"সান্যালমশাইয়ের গাড়ির সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট? কখন হল ব্যাপারটা?"

"বোধহয় দু-এক ঘণ্টার মধ্যে। টাউন থেকে বাসটা এল তো খানিকটা আগে। বোধহয় তখন।"

"তা হলে আমরা যখন বাড়িটা দেখে ফিরছি তখনই হবে," বলে শিশির বাবুর মুখের দিকে তাকাল।

বাবুর মুখ দেখে মনে হল, তারও ধারণা ওই রকম।

চা আর শিঙাড়া নিয়ে একটা ছোকরা এল। শালপাতার ঠোঙায় করে গরম শিঙাড়া এনেছে, কেটলি করে চা। মাটির খুরিও এনেছিল।

শালপাতার ঠোঙা রেখে চা দিয়ে ছোকরা চলে গেল।

শিশির শিঙাড়া খেতে খেতে বলল, "বংশী, বাবুদা একটা কথা বলছিল। বলছিল, আমরা

যদি এইভাবে অন্ধের মতন ঘুরে বেড়াই কোনো কাজ হবে না। সিংহিবাবুই হোক আর সান্যালবাবুই হোক—কোনো একজনের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে। তার মানে এই নয় যে, আমরা ওদের বিশ্বাস করছি। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা আন্দাজ করতে হলে একটা পালটা চাল তো দিতেই হবে। বাবুদা বলছিল, সিংহিবাবুকে চালের ঘুঁটি করলে কেমন হয়। ভদ্রলোক নিজেই আমাকে বলেছেন, তিনি আমার শত্রু নন।"

বংশীর মুখে গরম শিঙাড়া কথা বলতে পারল না।

বাবু হেসে বলল, "বংশী, যুদ্ধের একটা বড় চাল হল দুজন যদি শত্রু থাকে—তার মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিজের কাজে লাগানো।"

বংশী বলল, "কথাটা ঠিক বাবুদা। কিন্তু কে যে বড় শত্রু আর কে ছোট শত্রু তা তো বুঝতে পারছি না। ধরুন ওরা দুজনে যদি এমন একটা সাঁট আগেই করে থাকে তাহলে আমরা তো সিংহিবাবুর খপ্পরে গিয়ে পড়ব।"

কথাটা শিশিরের মনে ধরলেও বাবুর ধরল না। বাবু বলল, "দ্যাখো বংশী, কার স্বার্থ কতটা আগে আমাদের জানা দরকার।"

"কিন্তু স্বার্থ কী তা তো ধরতেই পারছি না।"

"সিংহির সঙ্গে ভাব পাতিয়ে সেটা জানতে হবে।"

বংশী চা খেল দু চুমুক। বলল, "বেশ তাহলে আপনারা ও-লাইনে চেষ্টা করুন। আমি অন্য লাইনে করি।"

"তোমার লাইনটা আবার কী?"

"আমি ভবতোষ সান্যালের আগের ব্যাপারটা জানতে চাই। শোনা কথা কোনো কাজের কথা নয়। ভদ্রলোক এত ধন-দৌলত কেমন করে করলেন, আগে সত্যি সত্যি কী করতেন, এখানেই বা কেন এ-ভাবে রয়েছেন—এটা জানা দরকার।" বলে বংশী একটু থামল, বার-দুই চুমুক মারল আবার চায়ে। বলল, "একটা কথা কিন্তু ঠিক। ওই টেলিগ্রাম সান্যালমশাই করেছিলেন।"

শিশির বলল, "ওটা তোমার সন্দেহ, প্রমাণ কোথায়?"

"প্রমাণ আমি দেব। পোস্ট অফিসের সবাইকে আমি চিনি। পোস্ট মাস্টার নতুন,

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির বিশেষ কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে···

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-FALOV.10-172 BG

অন্যরা পুরনো। তাদের আমি বলে রেখেছি। তবে, ওই সান্যালমশাইয়ের যে কলকাতায় টেলিগ্রাম করার শখ আছে—এটা আমায় পোস্ট অফিসের যাদবজি আজ বলেছে। উনি মাঝে মাঝেই কলকাতায় টেলিগ্রাম করেন।"

শিশির রীতিমত অবাক হয়ে গেল। বলল, "কলকাতায়! কেন?"

"তা বলতে পারব না। লোকজন আছে, হয়তো ব্যবসাপত্রও আছে কিছু। যাদবজি বলেছে, এবার থেকে লক্ষ রাখবে—কিসের টেলিগ্রাম যায়।"

রাত না হলেও বাবু উঠে পড়ল। বলল, "বংশী, আমরা যাই। বেশি রাত করব না। আমাদের একটু সাবধানে থাকা ভাল।"

বংশী বলল, "আসুন। টর্চ আছে?"

"হ্যাঁ।"

বাবু আর শিশির বেরিয়ে পড়ল। বাবুই বলল, "চল, বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে যাই।"

দুজনে বাঁ দিকে এগুল।

খানিকটা এগিয়ে একটা মোড়। তেমাথা। মোড়ের মুখে আসতেই দেখল, চ্যাটার্জিদা। থানা থেকে ফিরছেন বোধ হয়। এতক্ষণ থানায় তিনি কী করছিলেন কে জানে।

শিশিরই দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি এলেন চ্যাটার্জিবাবু। চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন শিশিরকে।

শিশির হাসি-হাসি মুখ করল। "থানা থেকে ফিরছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এত দেরি?"

"দেরিই হয়ে গেল। থানায় গিয়ে শুনলাম মিস্টার সান্যালের গাড়ি আবার একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে। গাড়ির দরজা খুলে একজন পড়ে গিয়েছে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে।"

"সে কী! কে পড়ে গেল?"

"সিংহিবাবু বলে এক ভদ্রলোক।"

শিশির কেমন শব্দ করে উঠল। পাশেই বাবু। বাবু বোকার মতন তাকিয়ে থাকল চ্যাটার্জিবাবুর দিকে।

(ক্রমশ)

ছবি : সুনীল শীল

ছবির মজা

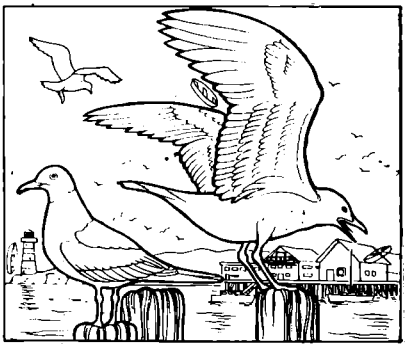

তোমার ছোট ভাই কিংবা ছোট বোনকে, রঙ-পেনসিল বুলিয়ে, এই ছবিটি রঙিন করতে বলো। কিন্তু তার আগে সে তিনটে নৌকো খুঁজে বার করুক। পারলে তাকে আদর করে দাও।

তোমার ছোট ভাই কিংবা বোনকে জিজ্ঞেস করো, এই চারটে জিনিসের কোন্‌টা চালু করতে বাতাস লাগে না। ঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে আদর করে দাও।

নতুন

প্রস্তুত হ'ল

প্রেস্টীজ

Patent pending

এক অতি অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার।

যখন খাদ্য-কণা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। সেইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন-কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টীজ! এর অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিন্তভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায়—সদাসর্বদা!

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন: মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত!

সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট-ফুট অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন স্ক্রু সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অকৃজিলিয়ারী হ্যাণ্ডেল—যা গরম হয়ে যায় না
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝকঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারান্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্ব্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্টীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

ttk উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

maa TTP 2 Ben c 81

শব্দ ধরে ধরে

সিদ্ধেশ্বর সেন

একটু-একটু করে
শব্দ ধরে ধরে
তোমার পা-ও টলটলে

একে-ওকে ডেকে
কখনও-বা মা-কে
কখনও বাবাকে
শোনাও হেসে খেলে

সবটা তোমার খেলা
কখনও ঘরকন্নায়
কখনও-বা মেলায়

নাগরদোলায় চেপে
অক্ষর নাও মেপে
এ-সবই কী মজায়

স্বরে 'অ' থেকে
স্বরে 'আ'-য় বেঁকে
হ্রস্ব 'ই' দীর্ঘ 'ঈ' হয়ে...

তোমার খালি চলা
কেবল কথা বলা
আমার লাগে কী যে

বলতে পারো কোথায়
তোমার স্বপ্ন থোকায়-
থোকায় থাকে ভরে?

সে-সব যেন শিউলি
গোড়ার বর্ণগুলি
শিশির-ধোওয়া
ছড়িয়ে যাও ভোরে॥

ছটফটে এক মাছি

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

ছটফটে এক মাছি
উড়ছে কাছাকাছি।
বসছে খালি নাকে,
যতই তাড়াই তাকে,
বসছে এসে আবার—
নাকটা যেন খাবার!
একটুখানি ঘুমুই,
তার কি আছে জো রে?
নাকের ডগায় মাছি
দিব্যি আছে চড়ে!
গা জ্বলে যায় দেখে
মাছির রকম-সকম;
মারতে গিয়ে মাছি
নাকটা হল জখম!

ছবি : দেবাশিস দেব

কালকা মেলে কাশীদা

রঞ্জন ভাদুড়ী

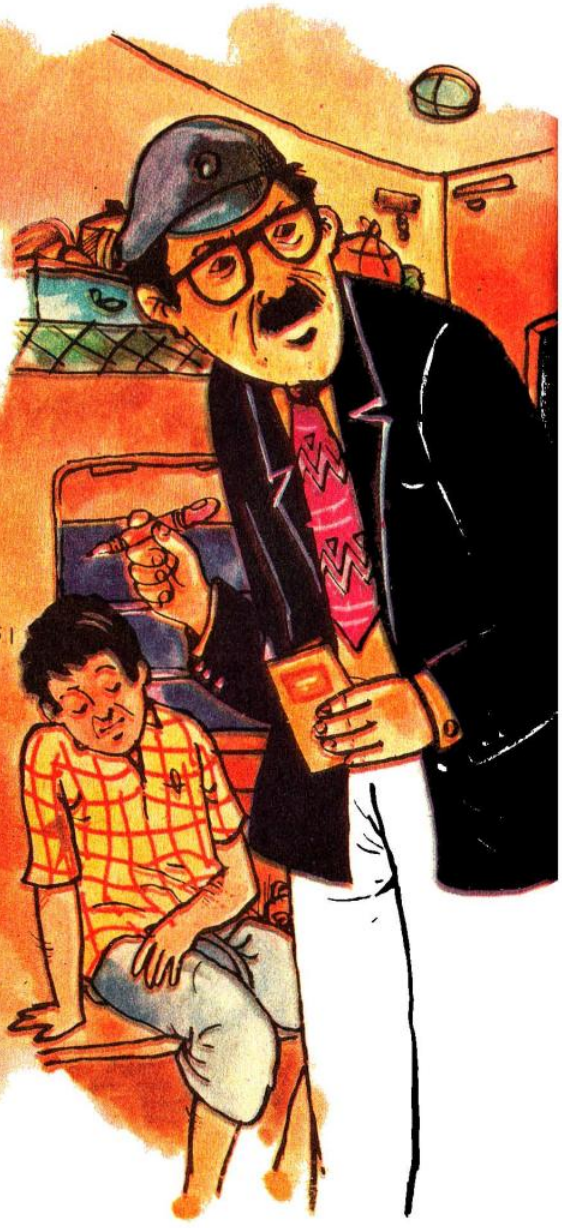

কাশী চলেছেন রেলে
ডাউন কালকা মেলে—
ছোটে গাড়ি ঝড়ের গতিতে।
ছোটবড় ইস্টিশান
শব্দে হয় খানখান
দাঁত আছে অঘ্রানের শীতে।
এখন গভীর রাত
ঘুমের নরম হাত
বিলি কাটে কাশীর নয়নে,
কিন্তু কাশীদার কাছে
গোপন খবর আছে
তাই তিনি যান না শয়নে।
গাঢ় হবে রাত যবে
গাড়িতে ডাকাতি হবে,
এবং এই টু-টিয়ার কোচে—
তা-ও জেনেছেন কাশী,
তবু তাঁর ঠোঁটে হাসি,
থেকে-থেকে চাড়া দেন মোচে।
সেবার চম্বল গিয়ে
ডাকুদের শিক্ষা দিয়ে
এসেছেন স্রেফ তিনি একা।
তার পরে বহুদিন
কেটেছে ঘটনাহীন—
পাননি তো ডাকাতের দেখা।
এসেছে সুযোগ আজ—
রেল-ডাকাতির কাজ
করে যারা তাদের ক'জন
সমুচিত শিক্ষা পাবে,
সদলে শ্রীঘরে যাবে—
শিখে যাবে সাধন-ভজন।
ডাউন কালকা মেলে
কে আছে জানতে পেলে
তোরা কি মাড়াবি এই পথ?
তোরা তো কাল-কা যোগী—
কুকাজের ফলভোগী
হবি আজ, দুর্বৃত্ত অসৎ!

মোগলসরাই থেকে
আলোর পাউডার মেখে
গাড়ি ফের অন্ধকারে ঢোকে।
কাচের জানালা দিয়ে
কাশীদা দেখেন কী এ—
কার ছায়া? এত রাতে ও কে?
ও হরি— ঘুরিয়ে মুখ
দেখে হন নিরুৎসুক—
ডাকু নয়, টিকিট-চেকার!
হতাশ হলেন কাশী,

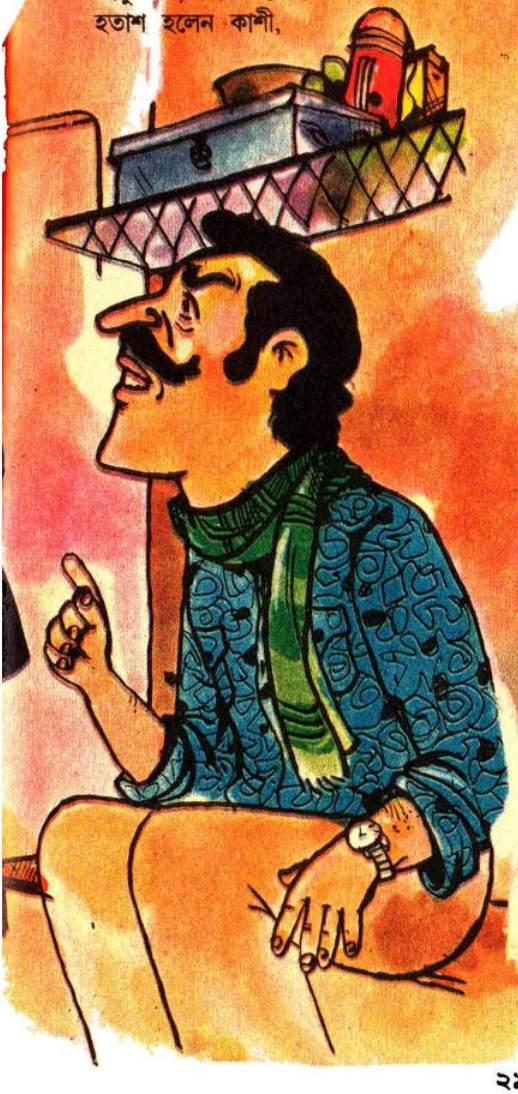

বাজে এঞ্জিনের বাঁশি,
জেগে থাকা বুঝি-বা বেকার
বাজে বাঁশি দমে-সমে
গাড়ির গতিও কমে,
ধীরে-ধীরে থেমে যায় গাড়ি।
কেউ কি টেনেছে চেন,
তাই থেমে গেল ট্রেন?
উঠে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি।
তুলে জানালার কাচ
কাশীদা করেন আঁচ
গাড়ি থেকে নেমে কারা সব
অন্ধকারে মিশে যায়,
ডাকুরা পালায়, হায়
নেই তবু গেল-গেল রব!
এ-কথাও মনে হয়,
তবে কি ডাকাত নয়?
চোরাইচালানদার নাকি?
টর্চের সন্ধানী আলো
ফালা-ফালা করে কালো,
তবু ওরা দিয়ে গেল ফাঁকি।
যে হোক, চুলোয় যাক!
যাত্রীদের আর্ত ডাক
শোনা-টোনা যায়নি যখন
তখন ডাকাত নয়,
সে-বিষয়ে অসংশয়
হয়েও কাশীদা খুশি নন।
মনে হয় ডাকাতেরা
আজকে ছাড়েনি ডেরা,
হয়তো-বা পেয়েছে খবর—
ডাউন কালকা মেলে
ডাকাতি করতে গেলে
হবে আজ বিপদ জবর।

যাহোক, ছেড়েছে গাড়ি—
দ্রুততর হয় পাড়ি,
ছুটে চলে যাত্রীদের নিয়ে।
রাত ক্রমে ভোর হয়,
জেগে থাকা আর নয়,
কাশীদাদা পড়েন ঘুমিয়ে।

ছবি দেবাশিস দেব

রোভার্সের রয়
বসরান দু কোটি টাকা দিতে চেয়েছিল। রয় তবু কোচ হতে চায়নি। পেনি ক্ষুব্ধ, রয় তাই মন দিয়ে খেলতে পারছে না...
চাকরিটা নিলেই পারতে। বড্ড বাজে খেলছ।
কী বলতে চাও তুমি মার্ভিন?
বলছি, খেলায় তোমার মন নেই!
বাজে কথা!
কী হচ্ছে?
ঝগড়া কোরো না। নরবরো আমাদের...
দারুণ চেপে ধরেছে!
ROVERS
গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে চার্লি...
তারপর দারুণভাবে আটকে দিয়েছে বল।
ওঃ!
কীভাবে বাঁচিয়ে দিল দেখলে?
রয় ও মার্ভিনের ঝগড়া অনেকেরই চোখে পড়েছে...
এই নাও!
ঝগড়া না-করে এখন খেলো!
বল নরবরোর সীমানায়...
যাঃ!
বলটা ধরো মার্ভিন!
রুখতে পারেনি!

নাও রয়!
রয়কে সুন্দর বল দিয়েছে!
রয়ও কোনো ভুলচুক করল না!
গোল! গোল!
ঝগড়া না-করলে আমরা ভালই খেলি মার্ভিন!
কিন্তু তখন অত চটে গেলে কেন?
হাফ-টাইমের সময় প্রশ্নটার জবাব দিল রয়...
চাকরিটা না-নেওয়ায় পেনি রেগে গিয়ে আজ খেলা দেখতে আসেনি!
এই ব্যাপার?
হায়, হায়, বাড়িতে এত অশান্তি?
হাহা!
ঠাট্টা করছ?
করো। কিন্তু আর নয়, নরবরোকে আজ শিক্ষা দেওয়া চাই!
খেলা আবার শুরু হল...
আরে, পেনি দেখছি মাঠে এসেছে!
তাই তো!
কিন্তু পাশে তো শেখের লোক।
মতলবটা কী বলো তো?
রয়ও সব লক্ষ করেছে...
পেনি ওকে নিয়ে মাঠে এল কেন? নিশ্চয় কিছু একটা ফন্দি এঁটেছে শেখ!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

আমি যদি স্কোয়াল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করি এক্ষুনি তবে হামলা থামবে। তবে আমি প্রোফেসর স্মিথের কথায় রাজি হচ্ছি না কেন?
তাই তো, কেন?
তুমি বিদেশী, তবু জেনে রাখো, রাজি না-হবার কারণ আর কিছুই নয়, প্রোফেসর স্মিথ আর তার এই কোম্পানিটিকে আমি পছন্দ করি না।
তাই?
কিন্তু, পাইপলাইনের ওপর হামলার ব্যাপারে কী যেন তুমি বলছিলে?
পাইপ উড়িয়ে দিয়ে ফের ঘোড়ায় উঠল ওরা। লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি দেখছিলুম, হঠাৎ...
জাহাঁপনা! জাহাঁপনা!
কে আবার বিরক্ত করতে এল?
জাহাঁপনা! আপনার ছেলে...
আবার সে কী দুষ্টুমি করল?
জাহাঁপনা, দুষ্টুমি নয়, তিনি নিখোঁজ!
হাহাহা! আবদুল্লা নিখোঁজ? অসম্ভব! দ্যাখোগে, দুষ্টুমি করে কোথাও লুকিয়ে আছে! বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, এসো আমার সঙ্গে।
বাগানে তিনি খেলছিলেন, হঠাৎ...
আরে, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?
ছ বছরের ছেলে। গত জন্মদিনে এই মোটরটা উপহার দিয়েছি।
আবদুল্লা! ওরে আবদুল্লা! কোথায় লুকিয়েছ মানিক?
?
জাদু আমার বেরিয়ে এসো।
ওরে আমার দুষ্টু-সোনা!
মিষ্টি-সোনা!
ওরে পাজি, না-বেরোলে কিন্তু রেগে যাব।
আপনার ছেলের পরনে কি নীল পোশাক ছিল?
না তো! কী ব্যাপার?
গাছের ডালে এই নীল কাপড়ের টুকরো। গাছের তলায় পায়ের ছাপ। নিশ্চয় কেউ গাছে উঠে লুকিয়ে ছিল।
তা হতে পারে।
মোটরগাড়িটা ঠেলা মেরে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কী বলতে চাও তুমি?
বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। দেখি, আরও সূত্র পাওয়া যায় কিনা।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

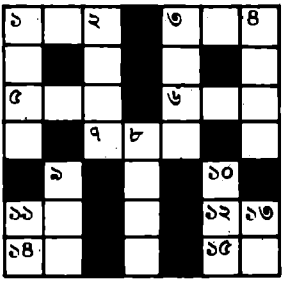

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ছোট আগ্নেয়াস্ত্র। (৩) পৌরাণিক কোন্ রাজার রাজ্য ঋষিশাপে বন হয়ে গেছে? (৫) যে সত্যিকথা বলে না। (৬) আবৃত্তির বিষয়। (৭) আমগাছ। (১১) ঘাসবিশেষ। (১২) পথ। (১৪) পৃথিবী। (১৫) পরীক্ষার পর কিসের আশায় বসে থাকো?

উপর-নীচ : (১) মিশরের বিখ্যাত স্থাপত্য। (২) জাহাজের খালাসি। (৩) পুরুত নয়, অথচ ঘণ্টা বাজায়। (৪) যে-নদী মাইকেলের স্মৃতি ধরে রেখেছে। (৮) বুদ্ধ কোথায় প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন? (৯) বিখ্যাত মুনি। (১০) বড় গলায় আওয়াজ নেই কার? (১১) নিকটের বিপরীত। (১৩) মাঝিও ধরে, চাষিও ধরে—কী?

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

পেঁ	পে		ব	সু	ধা	রা
	য়া				মা	
ক	রা	চি		চ	র	কা
		কু	টু	ম		
মু	কু	র		র	হি	ম
	লি				জ	
কু	শ	ধ্ব	জ		ল	তি

ধাঁধা

বাজারটা নামিয়েই ছোটকা বসল চায়ের টেবিলে। ইশারায় আমাকে বলল, পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিতে। আমি উঠে গিয়ে রেগুলেটরের নবটা ঘুরিয়ে দিলাম। রুমালটা বার করে ছোট্কা ঘাম মুছতে লাগল।

সেজদাদু এতক্ষণ বাজার মেলাচ্ছিল। ফর্দ দেখে-দেখে পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছিল, সব জিনিস এসেছে কিনা। সেজদাদু ফিরে এসে ছোট্কার উলটোদিকের চেয়ারে বসল। ছোট্কা জিজ্ঞেস করল,"সব ঠিক হ্যায়?"

সেজদাদু বলল, "ঠিক তো হ্যায়। কিন্তু দাম পড়ল কী-রকম? টাকায় কুলিয়ে গেছে?"

ছোট্কা একটু হেসে বলল, "তা গেছে। তবে বাজার খুব চড়া। মাংস নিল ২৯৬ টাকা, মাছ ৮২ টাকা।" পকেট থেকে খুচরো কয়েকটা টাকা আর কিছু পয়সা বার করে সেজদাদুর দিকে এগিয়ে দিতে-দিতে ছোট্কা বলল, "নাও, এই ফিরেছে।"

সেজদাদু বলল, "মাছে কুলিয়ে যাবে তো? কতটা এনেছ?"

ছোটকা দু-মিনিট একটু চুপ করে রইল। একটা কাগজ বার করে চটপট কী একটা হিসেব করে নিল, তারপর মজার মুখ করে বলল, "কতটা মাংস কতটা মাছ, তুমি নিজেই করো তা আঁচ।"

ছড়া মিলিয়ে কথা বলা মানেই ছোট্কার যে ধাঁধার মুড, আমরা বিলক্ষণ জানি। সেজদাদুর মুখেও হাসি-হাসি আভা। বলল, "সমাধান যে করব, সূত্র কই?"

ছোট্কা জবাবে যা বলল, তাই দিয়েই এবারের ধাঁধা শুরু করি।

প্রথম ধাঁধা ॥ মাছ আর মাংস মিলিয়ে মোট ২০ কেজি কেনা হয়েছে। মাছের দর মাংসের দামের থেকে কেজিতে ২ টাকা বেশি। মাছের মোট দাম ৮২ টাকা, মাংসের ২৯৬ টাকা।

মাছ কতটা কেনা হয়েছে, মাংসই বা কত কেজি?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ অদ্ধটির ভাই মারা গেছে। যে মারা গেছে তার ভাই বা দাদা ছিল না। অদ্ধটি তাহলে মৃতের কে হয়?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পুরনো শহরের নাম জট পাকানো অবস্থায় রয়েছে, বার করতে পারো?

পা ত্র পু লি ট

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১, ২, ৪, ৮, ১৬ এবং ৩২ কেজির ৬টি বাটখারা দিয়েই ১-থেকে ৪০ কেজি পর্যন্ত ওজন অনায়াসে করা যাবে। (২) ১২৯ (৩, ৯, ২৭ করে বেড়েছে, সুতরাং পরবর্তী সংখ্যাটি হবে ২৭×৩ বা ৮১ (বেশি)। (৩) পরশুরাম।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

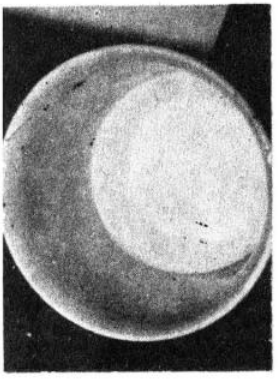

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল গণ্ডারের খড়্গের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ আচ্ছা, আমি ঠিক শুনতে পাই নি, আপনি কি আমাকে নির্বোধ বললেন?

উঃ কেন, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর বুঝি কোনো নির্বোধ নেই।

প্রঃ আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে বড় ভাল লাগল। জানেন, আমার মাথাটা খুব ধরেছিল, এবার ছেড়ে গেল?

উঃ ছেড়ে বেশি দূর যায়নি, আমার মাথায় চেপেছে।

প্রঃ আপনি তো বৃদ্ধ হয়েছেন, বাল্যকালের কোনো ইচ্ছা কি আপনার পূর্ণ হয়েছে?

উঃ ছোটবেলায় স্কুলে মাস্টারমশাই যখন চুল ধরে টানতেন, তখন ভাবতাম, আহা, আমার যদি চুল না থাকত। সে-ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়েছে।

মজার খেলা

ছটা ক্যারামের ঘুঁটি নাও, তিনটে সাদা, তিনটে কালো। নীচের ছবির মতন কালো তিনটে রাখো বাঁ দিকে, একটু জায়গা রাখো, তারপর বসাও তিনটে সাদা ঘুঁটি—

খেলাটা হল, কালো ঘুঁটিগুলো সব চলে আসবে ডান দিকে, সাদা ঘুঁটিগুলো সব বাঁ দিকে। ঘুঁটি চালবার শর্ত হল, এক দানে যে-কোনও ঘুঁটি পাশের ফাঁকা জায়গায় সরতে পারে, অথবা একটা ঘুঁটিকে টপকে তার পাশে বসতে পারে। কালো ঘুঁটি টপকে সরবে ডান দিকে, সাদা ঘুঁটি টপকে আসতে পারবে বাঁ দিকে।

এই ভাবে ক' দানে ঘুঁটিগুলোর জায়গা বদল করতে পারো?

একটা উত্তর নীচে দেওয়া হল। পনেরো দান লাগছে। অন্য উত্তরও হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা শিখিয়ে দিচ্ছি। ছবি দেখে-দেখে অভ্যেস করো—

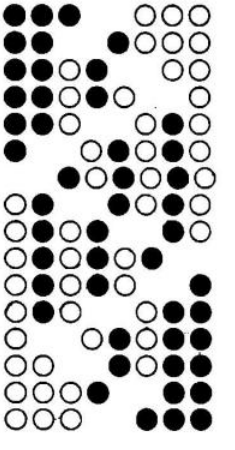

সুসেন

হাসিখুশি

"তুই এবারও ফেল করলি বিল্টু? তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না। এই নিয়ে তুই ক্লাস সেভেনে তিন বছর থাকলি।" বিল্টুর মায়ের চ্যাঁচামেচি শুনে বিল্টুর ঠাকুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ওকে অমনভাবে বকছ কেন বৌমা? বোকো না। মাঝে-মাঝে ফেল করা তো ভাল। বছর-বছর নতুন বই কেনা কি চাট্টিখানি কথা।"

শশধরবাবু ছেলের একগুচ্ছ ছবি দেখিয়ে বললেন, "কিশোর বিলেতে এক নামজাদা শিল্পীর কাছে ছবি আঁকার তালিম নিয়েছে, এই ছবিগুলো সেখানে বসেই আঁকা।"

সমালোচক-বন্ধুটি বললেন, "তাই বলো, 'পূর্ণিমা'র ছবিটা দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল, ওরকম পূর্ণিমা তো আমাদের দেশে কখনো হয় না।"

"আপনাকে কয়েকটা আয়রন-ট্যাবলেট লিখে দিচ্ছি। রোজ দু'বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর নিয়ম করে খান। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

"ওরে বাবা, অত শক্ত-শক্ত ট্যাবলেট আমি খাব কী করে? আমার সব দাঁতের যে বারোটা বেজে যাবে।"

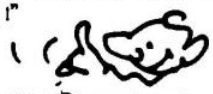

চার ঘণ্টা বক্তৃতা দেবার পর বক্তা বললেন, "আমার বক্তৃতা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। দুঃখিত। কিন্তু কী করব বলুন, আজ হাতঘড়িটা আনতে ভুলে গিয়েছি।"

একজন অধৈর্য শ্রোতা উত্তর দিলেন, "হাতঘড়ির কী দরকার, আপনার ঠিক পেছনেই তো ক্যালেণ্ডার ছিল—একটু দেখে নিলেই পারতেন।"

মজারু

ছবি অহিভূষণ মালিক

তোতাকাহিনী

(ইন্দোনেশিয়ার উপকথা)

আরতি দাস

ইন্দোনেশিয়ার এক গ্রামের ছেলে, মুজুকিন। বড় গরিব। দিনমজুরি খেটে কাঠ কেনার পয়সাও জোটে না ওর। তাই জঙ্গল ঢুঁড়ে জ্বালানি কাঠ যোগাড় করে আনতে হয় ওকে। এইরকম কাঠের খোঁজে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন মস্ত বড় এক গাছের তলায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মুজুকিন।

বিশাল গাছে অসংখ্য তোতাপাখির বাসা। ভোরবেলা খাবার খুঁজতে বেরিয়ে গেছে তোতারা। এখন শূন্য বাসাগুলি হাওয়ায় নড়ছে, দুলছে। কম করেও একশো তোতা থাকে এই গাছে। ধাঁ করে একটা মতলব খেলে গেল মুজুকিনের মাথায়।

এত পাখি ধরতে পারলে বাজারে বেচে বেশ কিছু লাভ হবে ওর। খাবার-দাবার জামা-কাপড় কেনার পরেও কিছু পয়সা বাঁচবে। বাড়তি পয়সায় পান-সুপুরি কিনে দিব্যি আয়েস করে কদিন পান চিবোনো যাবে। এইসব ভেবে পরদিন পাখি ধরার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মুজুকিন। সরঞ্জাম বলতে বেশ খানিকটা বওলার আঠা। এ আঠা এমনই মোক্ষম যে, এর সঙ্গে সেঁটে গেলে গায়ের ছালচামড়া না ছাড়িয়ে ছাড় পাবার জো নেই।

মুজুকিন সেই গাছে উঠে, এক-এক করে সব তোতাপাখির বাসায় দিব্যি চপচপে করে আঠা মাখাল। তারপর নেমে এল গাছ থেকে। কিন্তু গাছের মগডালে সর্দার তোতার বাসাটা মোটেই ওর নজরে পড়েনি। দলের সব-সেরা পাখির বাসাটাই বেঁচে গেল আঠার হাত থেকে।

কাজ শেষ করে অনেক আশা নিয়ে বাড়ি ফিরল মুজুকিন। ভাবল, কাল সব তোতারা সেঁটে থাকবে বাসায়। ও টপাটপ ধরবে আর খাঁচায় পুরবে।

এদিকে তোতাপাখিরা সারাদিন উড়ে সন্ধেয় যে যার বাসায় ঢুকে বসতেই ঢুলুনি এল চোখে। হঠাৎ বাচ্চা এক তোতা ককিয়ে উঠল, "এ মা, আমার গা-টা কী বিচ্ছিরি আঠা-চটচটে লাগছে!"

তারপরে একে একে সব পাখির বাসা থেকেই চেঁচামেচি শোনা যেতে লাগল।

"আরে! আমার পালকগুলো যে একেবারে আটকে গেছে আঠায়। আমি একদম আটকে গেছি বাসার সঙ্গে।"

চেঁচামেচিতে সর্দার তোতার ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সবাইকে ডেকে বলল, "তোমরা সবাই শান্ত হও, চুপ করো। আমার কথা শোনো।"

সর্দার বলল, "এ নিশ্চয়ই কোনো ধড়িবাজ মানুষের কাজ। চালাকি করে তোমাদের বাসায় আঠা মাখিয়ে গেছে। কাল এসে সবাইকে ধরবে।

"আমার কথা শোনো। কাল যখন লোকটা আসবে তোমরা সবাই মড়ার মতো নাক-মুখ সিঁটিয়ে পড়ে থাকবে বাসায়। একচুলও নড়বে না। মরা পাখি ভেবে তোমাদের এক এক করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নীচে। মাটিতে পাখি ফেলার সময় ঝুপ-ঝুপ করে শব্দ হবে। ঝুপ-ঝুপ শব্দটা নিরানব্বই পর্যন্ত গুনবে। সবসুদ্ধু নিরানব্বইজন আছি আমরা। শেষ পাখি ফেলার আওয়াজ কানে গেলেই একসঙ্গে সবাই পাখা মেলে

উড়বে আকাশমুখো। না হলে মানুষের হাতে নির্ঘাত মরণ হবে আমাদের।"

সর্দারের কথামতো চুপচাপ রাত কাটিয়ে দিল তোতারা। পরদিন সকালে মুজুকিন গাছে উঠে পাখিদের বাসায় উঁকি দিয়ে থ' হয়ে গেল। সবই তো মরাপাখি! গায়ের আঠা ছাড়িয়ে, এক একটা করে তোতা তুলে নিয়ে দেখে মুজুকিন, আর তারপরই দারুণ রাগে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় গাছের নীচে। আটানব্বইটা পাখি ছুঁড়ে দেবার পরে হল কী, মুজুকিনের কোমরে গোঁজা ছুরিখানা ঝুপ করে পড়ে গেল নীচে।

গাছতলার তোতারা ভাবল তাহলে নিরানব্বইটা তোতাই এসে গেছে, এবারে ওড়া যাক। নীচে পড়ে থাকা তোতারা তীরের মতো

উড়ে উধাও হয়ে গেল মুহূর্তে। সর্দার তোতা তখনও চোখ বুজে মড়ার মতো পড়ে আছে বাসায়।

এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে মরা পাখিদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল মুজুকিন। চোখ ফেরাতেই নজর পড়ল সর্দার-তোতার বাসায়। আরে, এটাকে তো বেশ জ্যান্ত বলেই মনে হচ্ছে। খপ করে তাকেই ধরে পুরে ফেলল খাঁচায়। বলল, "খুব ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছে

অনিবার্য কারণে 'সদাশিব' এ-সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। খুব শিগগিরই তোমরা আবার তার দেখা পাবে।

তোমার জাতভাইরা। সহজে ছাড়ছিনে তোমাকে।"

সর্দার বুঝল, দলকে বাঁচাতে গিয়ে ও নিজেই ধরা পড়ে গেছে। তখন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বলে উঠল, "আমায় প্রাণে মারবেন না। যত্ন করে রাখলে, আমার থেকে প্রচুর ধনদৌলত টাঁকাকড়ি হবে আপনার। বরাত ফিরে যাবে।"

"সত্যি নাকি!" তোতার কথায় হো-হো করে হেসে উঠল মুজুকিন। তারপর খাঁচায়-পোরা পাখি নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়ি ফিরে সর্দার তোতার খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিল ঘরের চাতালে। পাখি দেখতে ভিড় করে এল পাড়ার লোক। এত সুন্দর পাখি জন্মেও দেখেনি কেউ। পাখির গান যে শোনে, সে-ই মুগ্ধ।

দেখতে দেখতে মুজুকিনের তোতার কথা রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল। কাতারে-কাতারে লোক আসতে লাগল চতুর্দিক থেকে। তাদের হাতে তোতার জন্য ফল, ছাতু। মুজুকিনের জন্য দামি পোশাক, নানারকমের উপহার। সবার মুখে এক কথা, "এই সব নাও মুজুকিন। তোমার তোতাকে দেখতে দাও। একবারটি গান শুনতে দাও তোমরা পাখির।"

তোতার কথামতো সত্যিই বরাত ফিরে গেল মুজুকিনের। খাবার-দাবার দামি পোশাকে ভরে গেল ওর বাড়ি। শেষে ও-দেশের রাজার কানেও পৌঁছল খবরটা।

রাজার লোক এল ডাকতে। বলল, "মুজুকিন, রাজা তোমাকে ডেকেছেন। তোমার তোতাকে দেখতে চান, শিগগির চলো।"

পাখি নিয়ে রাজসভায় এসে দাঁড়াতেই সর্দার-তোতাকে দেখে রাজা অবাক। এমন আশ্চর্য সুন্দর তোতা তিনি দেখেননি কখনো। বললেন, "মুজুকিন, তোমার তোতার গান শুনিয়ে দাও।"

গান গাইল তোতা। গানের মিষ্টি সুর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর মিলিয়ে গেল আকাশে। শুধু সুরের রেশটা লেগে রইল সবার কানে।

অপূর্ব! মুগ্ধ রাজা তখনই কিনতে চাইলেন তোতাকে। বললেন, "যা খুশি, যত ইচ্ছে ধনদৌলত চাও দেব। এ পাখি আমায় দাও।"

তোতাকে বেচে দেবার একটুও ইচ্ছে নেই মুজুকিনের। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে তোতা ফিসফিস গলায় বলল, "আমায় বেচে দাও মুজুকিন। এতে খুব লাভ হবে তোমার।"

অগত্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজি হল মুজুকিন। রাজা এত ধনরত্ন দিলেন যে, রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল ও।

রাজবাড়ির বাগানে সোনার খাঁচায় রাখা হল তোতাপাখিকে। সোনার খাঁচায় রুপোর দাঁড়ে বসে দোল খায় পাখি, মিষ্টি সুরে গান গায়। সবাই অবাক হয়ে শোনে।

এত আদর-যত্ন, তবু সর্দার-তোতার মনে কোনো সুখ নেই, সারাক্ষণ ওর মনে এক চিন্তা—কী করে এই খাঁচার বাইরে যাবে ও। জঙ্গলের সেই জাতভাইদের দলের সঙ্গে একত্রে পাখা মেলে উড়বে খোলামেলা আকাশে।

একদিন সকালে রাজবাড়ির লোকরা বাগানে আসতেই দেখল, অমন সুন্দর তোতা-পাখিটা মরে পড়ে আছে খাঁচায়। খবর পেয়েই ছুটে এলেন রাজা।

প্রিয় পাখির দিকে তাকিয়ে চোখে জল এসে গেল রাজার। তখনই হুকুম দিলেন, অজস্র ফুল-ঝরে-থাকা বাগানের এক-কোণে কবর খুঁড়তে। মাটি খোঁড়া হয়ে গেলে ধবধবে সাদা রেশমের কাপড় পেতে তোতাকে নিজের হাতে শুইয়ে দিলেন রাজা। কিন্তু, মাটি চাপা দেওয়ার আগেই উড়ে গেল তোতা।

অতি প্রিয় পাখিটিকে জীবন্ত দেখে রাজার আনন্দ আর ধরে না। ওদিকে, তোতাও মনের সুখে নীল আকাশে উড়তে-উড়তে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

ছবি অনুপ রায়

চোরের খোঁজে

আমি সেদিন সকালে উঠে দেখি মায়ের একটা সোনার বালা নেই। তক্ষুনি আমি পুলিশে খবর দিলাম। পুলিশ এসে বালা খুঁজতে গেল।

চোরটার একটা পোষা বাঘ ছিল। চোরটা বাঘটাকে বলেছিল, পুলিশ এলে তুই পুলিশকে আটকাবি।

পুলিশ যেই না এসেছে, বাঘ পুলিশকে আটকাল। বাঘের সঙ্গে পুলিশের ভীষণ যুদ্ধ হল। পুলিশ বন্দুক দিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলল। তারপর চোরকে ধরে জেলে ভরল।

সুরজিৎ সিংহ (বয়স ৭)

মাইথনের স্মৃতি

ছুটিতে মাইথন বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাস থেকে নেমেই পাথুরিয়া পথ। বাঁদিকে বিরাট উঁচু একটি জায়গা, গাছপালায় সাজানো। ওদিকে সম্পূর্ণ 'ড্যাম'-এর মডেল। গাছপালার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে পৌঁছলাম বাঁধের ওপর।

বাঁধটিতে আছে বারোটি দরজা। উলটো দিকে থৈ-থৈ করছে দামোদরের জল। মাঝখানে কয়েকটি কৃত্রিম দ্বীপ। একটু এগিয়ে গেলেই ট্রান্সফরমার। তার পাশে বিরাট পাহাড়।

জানতে পারলাম, ওই পাহাড়টা ফাঁপা, এবং ওর মধ্যেই আছে জলবিদ্যুৎ তৈরির প্রধান যন্ত্র। ওখানে কাজ করছে প্রায় দেড়শো লোক।

সব দেখে বাসে চাপলাম। বাস ছুটে চলল কল্যাণেশ্বরীর পথে। আমিও মাইথনের কিছু স্মৃতি বুকে নিয়ে বাসের সঙ্গে এগিয়ে চললাম।

অরূপকুমার দে (বয়স ১৪)

দার্জিলিং

আমরা দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলাম। খুব আনন্দ হয়েছিল। চারদিকে বড়-বড় পাহাড়, ফুলে-ফুলে ঢাকা। দূরে বরফের পাহাড়।

এখানে রাস্তাঘাটে অনেক লোমওয়ালা কুকুর আছে। এখানে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, রোদও ওঠে। আমরা সব জায়গায়ই হেঁটে-হেঁটে ঘুরেছি।

চিড়িয়াখানাটা বেশ সুন্দর। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে টয়-ট্রেন যেত। টয়-ট্রেনে অবশ্য চড়া হয়নি।

দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় আমাদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ইন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭)

ভাল্লুকের বদলে

দুই বোন,গোলাপি আর বরফি। গোলাপিকে দেখতে গোলাপ ফুলের মতো, আর বরফিকে দেখতে বরফের মতো।

একদিন বরফি আর গোলাপি শিকারে গেল। ওদের বাবা মেলা থেকে ওদের দুটো পিস্তল কিনে দিয়েছিল। তাই নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল ওরা। সন্ধে হয়ে গেলে ওরা দেখল, দুটো ভাল্লুক আসছে।

গোলাপি বরফিকে বলল, "আমরা দুজনে দুটোকে মারব।" বলে যেই না গুলি ছুঁড়েছে অমনি ভাল্লুকের চামড়া খসে গিয়ে হয়ে গেল দুই রাজপুত্র। ওরা ছুটে গিয়ে দুই রাজপুত্রের হাত ধরে বাড়ি ফিরে এল।

স্বর্ণালি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

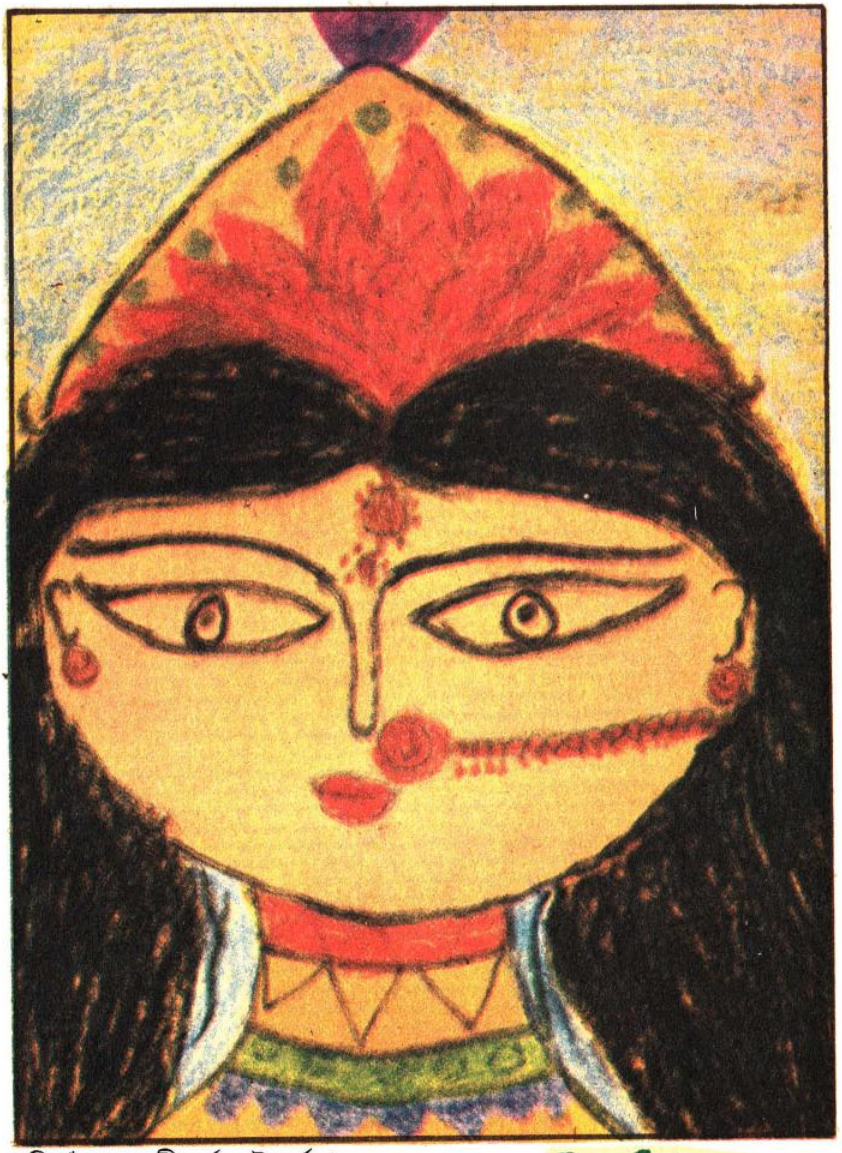

ছবি এঁকেছে শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য (বয়স ৮)

একটি বাঁদর

আমাদের কলাগাছে
কলা থোকা-থোকা
চুরি করে পেড়ে খায়
মুখ-পোড়া খোকা

খোকা নয়, খোকা নয়
একটি বাঁদর
তাড়া দিলে সে দেখায়
একটি চাপড়।

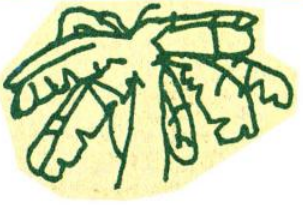

পূর্ণিমা দে (বয়স ৬)

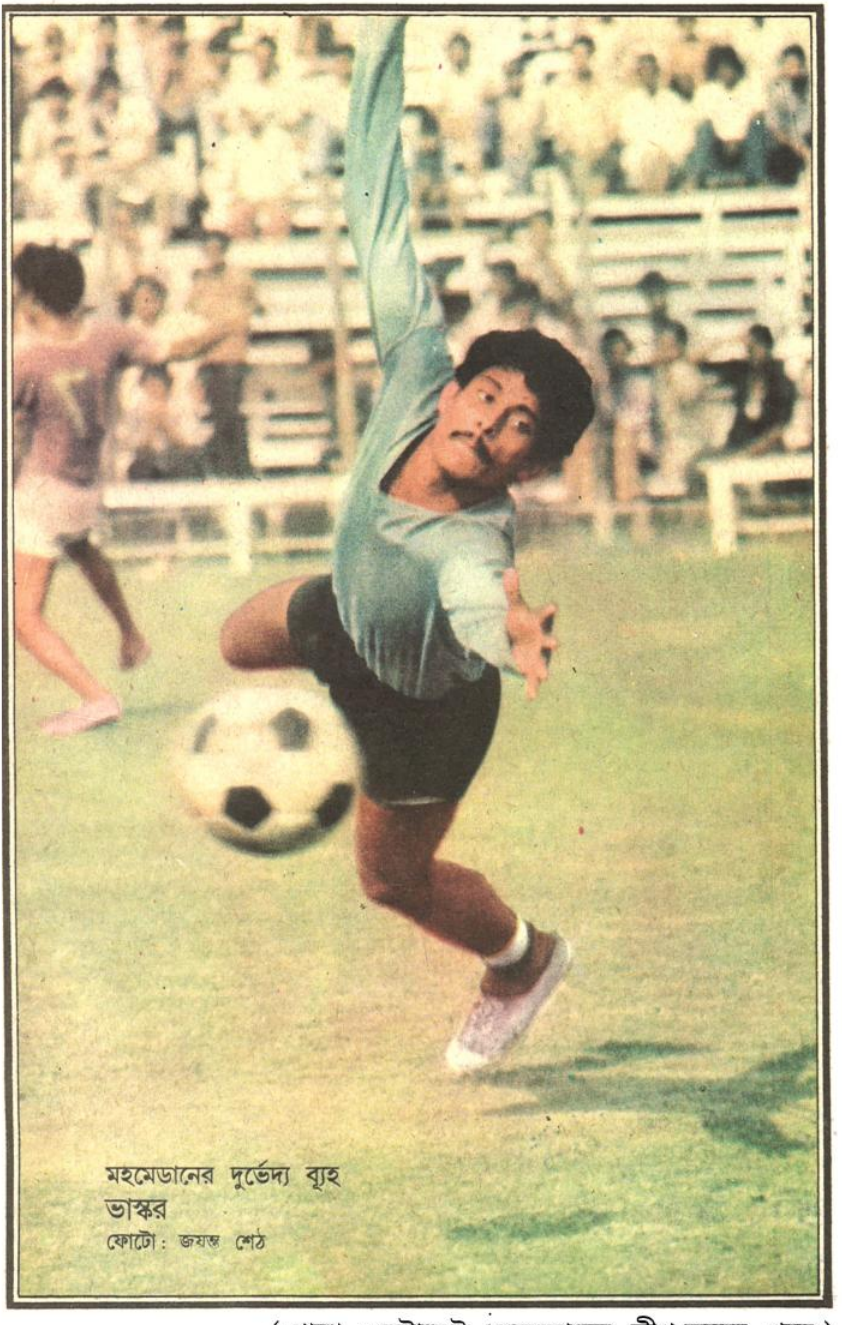

মহমেডানের দুর্ভেদ্য ব্যূহ
ভাস্কর
ফোটো : জয়ন্ত শেঠ

(পাতা ওলটালেই মহমেডানের লীগ-জয়ের খবর)

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন

সাদা-কালোর লাল দিন

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

বর্তমানকে বুঝতে হলে অতীতকে জানতেই হবে। 'টু নো দা বিয়িং য়ু মাস্ট নো দা বিকামিং।' এটা ইতিহাসের একেবারে গোড়ার কথা। গত ২০ আগস্ট সন্ধেবেলায় মহামেডান তাঁবুতে দাঁড়িয়ে বহুদিন আগে শোনা ওই কথাটাই মনে পড়ে গেল আবার। মহমেডান স্পোর্টিং সেদিন রাজস্থানকে হারিয়ে কলকাতা ফুটবল লীগের মুকুটটি তেরো বছর বাদে পুনরুদ্ধার করল।

মহমেডানের এই সাফল্যের বীজটি কিন্তু এই বছরই পোঁতা হয়নি। হয়েছে গত বছর। আশির দল-বদলের প্রথম কয়েক দিনেই যখন ইস্টবেঙ্গলের আট 'দুষ্টু' ছেলেকে আদর করে ডেকে নিল তখনই বুঝেছিলাম, মহমেডান এবার কিছু করতে চায়। কিন্তু মহমেডান সে-রকম কিছু পারল না। দারুণ লড়েও ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের কাছে হারল। টাই-ব্রেকারে। তারপর লীগ বন্ধ হয়ে গেল এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে, শীল্ডের খেলাও হল না। মহমেডান অবশ্য ডি সি এম ট্রফি, আধখানা রোভার্স কাপ এবং (অন্য নামে খেলে) সিকিম গোল্ড কাপ পেল।

কিন্তু তাতে কী? মহমেডান কলকাতার দল, কলকাতায় ট্রফি না পেলে মন ওঠে দলের?

এরপর একাশি সাল এল। কয়েকজন মোহনবাগান-কর্মকর্তা সুযোগ বুঝে 'শিক্ষা' দিতে গেলেন প্রসূন-মানস-বিদেশকে! মহমেডান লুফে নিল ওদের! প্রেমনাথ ফিলিপ, অমলরাজ আর সুরজিৎ চলে গেলেও মহমেডান চিন্তিত হল না। যারা রয়ে গেল, তাদের আর নতুনদের নিয়ে ভাল দল গড়ল।

কিন্তু সঞ্জয় গান্ধী গোল্ড কাপ এবং 'আধখানা' স্ট্যাফোর্ড কাপ পেলেও ফেডারেশন কাপের ফাইনালে উঠে হারতে হল

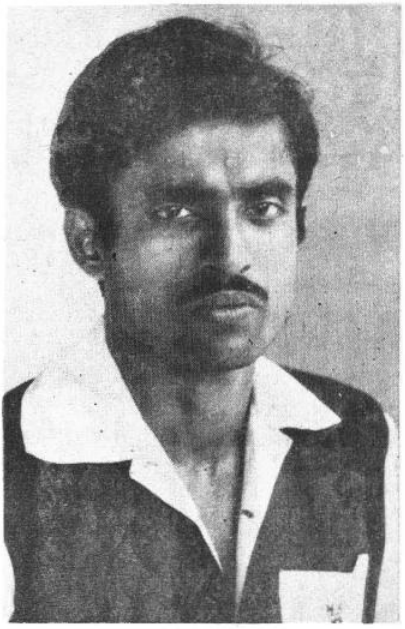

মানস (সেরা স্কোরার)

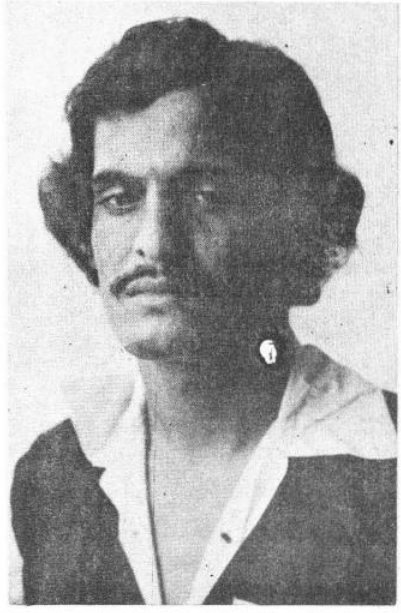

মইদুল (সুখী ক্যাপ্টেন)

মহমেডানকে। আবার সেই মোহনবাগানের বিরুদ্ধেই। মুষড়ে পড়লেন দলের সবাই। তাহলে কি কালো-সাদা জার্সির আলোর দিন আর আসবে না? 'মহমেডান যত ভাল দলই গড়ুক, কিছু পাবে না' এই নির্বোধ ধারণাটারই জয় হবে? মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলেরই প্রাধান্য বজায় থাকবে চিরকাল?

কিন্তু ওই হতাশা সাময়িক। কাটিয়ে উঠতে দেরি হল না। মোহনবাগানকে রুখে দিয়ে মহমেডান হারানো মনোবল ফিরে পেল। টীম স্পিরিট টগবগ করতে লাগল, ইস্টবেঙ্গলও হেরে গেল। মহমেডানকে আর পায় কে? সালকিয়া ফ্রেণ্ডস অবশ্য একটু নাড়া দিয়েছিল দ্বিতীয় ও শেষ পয়েন্টটি নষ্ট করিয়ে। অপরাজিত মোহনবাগানকে মাত্র একচুল পেছনে ফেলে মহমেডানই অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। সকলেই ভাল খেলেছে, তবুও বিশেষ করে নাম উল্লেখ করতে হয় এ-বছরের আবিষ্কার অলোক মুখার্জি, প্রশান্ত ব্যানার্জি ও মানসের; আর মোহনবাগানে অর্ধেক হৃদয় ফেলে এসেও যে মরিয়া হয়ে খেলেছে, সেই প্রসূনেরও।

এর আগে মহমেডান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোট দশবার—১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮, ১৯৪০-৪১, ১৯৪৮, ১৯৫৭, ১৯৬৭। তাদের উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ পাওয়ার রেকর্ডটি ভাঙে ইস্টবেঙ্গল—১৯৭৫ সালে। তবে মনে রাখতে হবে, সেবার মহমেডানকে একরকম জোর করে ধরে-বেঁধে হারানো হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে।

সে যাই হোক, ১৯৭১-এর আই এফ এ শীল্ডের পর মহমেডান এই প্রথম কলকাতায় কিছু পেল। তাই কোচ সাত্তার সাহেব, অধিনায়ক মইদুল ইসলাম ও সভাপতি এরফান তাহের র‍্যানডেরিয়ানের সঙ্গে কয়েক লক্ষ সমর্থকও দারুণ খুশি।

মহমেডানের এবারের জয়টা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে আরও আনন্দের এই জন্যেই যে, দল আরও দু'বার অপরাজিত (১৯৪৮, ১৯৬৭) থাকলেও এত অল্প পয়েন্ট নষ্ট করে এর আগে কখনও লীগ খেতাব পায়নি।

মহমেডান মাত্র পাঁচবার আই এফ এ শীল্ড

সর্বনাশের পৌষমাস?

শীত আসছে। কলকাতা আবার মনোরম হয়ে উঠবে।

শীতের সামান্য অবস্থানটুকু আমরা দারুণ উপভোগ করি। কি বল? তার ওপর তোমাদের আবার ক্রিকেটম্যাচ, কমলালেবু, ব্যাডমিন্টন। পরীক্ষার শেষ, বাৎসরিক ছুটি, সান্তাক্লজের উপহার। মটরশুটির কচুরি, ফুলকপির সিঙ্গাড়া। চিড়িয়াখানা, ঝিলমিল, বোটানিক্যাল গার্ডেন। পিঠে, পুলি, পায়েস। নতুন গুড়ের সন্দেশ।

কিন্তু শীত মানে ছেঁড়া কাঁথাও। বাঘের দাঁতের মত শীত। কনকনে ঠাণ্ডা আর সর্দি-কাশি-জ্বর। শীত মানে আতঙ্ক। কথায় বলে না যে 'কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ।'

না। কোন উপদেশ নয়। নিজেদের ও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবার মত করেই যদি বলি —পুরোনো জামা-কাপড়চোপড় অর্থাৎ আমাদের 'আনন্দের লেশমাত্র ভাগ' এই সর্বহারাদের কাছে যদি পেঁছে দেওয়া যায়? ধর শীতের ছুটিতে পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে একটা ছোটখাট 'ফাংশন' বা নাটিকা করলে। আর সেটা করা হ'লো স্কুলের হলঘরে বা পাড়ারই কোন বাড়ির মস্তবড় হলঘরটা চেয়ে নিয়ে। টিকিট, পোস্টার সব হ'লো হাতে লেখা। দাম করলে এক টাকা মাত্র।

তারপর? টিকিট বিক্রি হ'লো পঞ্চাশ/একশো টাকার। সেই টাকায় পাড়ার বস্তীবাসী শিশুদের মধ্যে সস্তার জামা, বইপত্তর বিলোনো যায় যদি?

ভেবে দেখো। এবং? জানিও। ক্ষণিকের আবেগ নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে আরও পাঁচজনের অসুবিধের কথা চিন্তা করে বড় হওয়াটাই সঠিক বেড়ে ওঠা। নইলে একা খেয়ে, একা হেসে, একা নেচে আনন্দ পাওয়াটা যে বড্ড স্বার্থপরতা।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ. ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

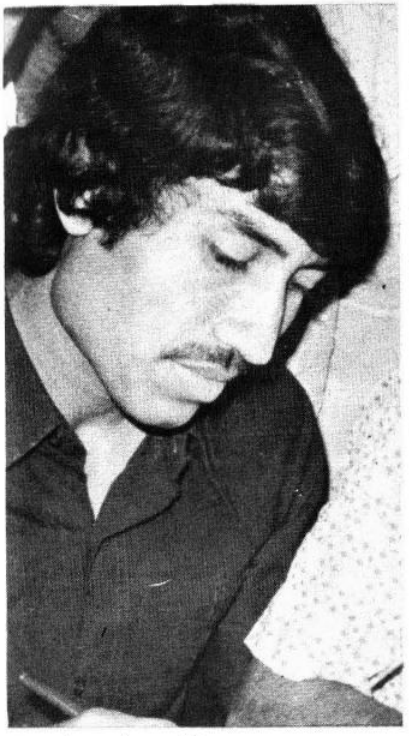

প্রসূন (মধ্যমাঠের প্রহরী)

পেয়েছে। রোভার্স-কাপ তিনবার, ডরাণ্ড একবার। খাতাপত্র না খুলেই বলে দেওয়া যায়, মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে অনেক কমবার। এর জন্যে দায়ী কিছুটা তাদের মন্দ ভাগ্য, আর অনেকটা ক্লাব নেতাদের 'ক্ষমতার লড়াই'। তাই প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে ডরাণ্ড ও রোভার্স কাপ এবং দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসেবে আই এফ এ শীল্ড যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা ওই সব সাফল্যের মূলধনকে কাজে লাগাতে পারেননি।

কিন্তু দিন বদলেছে। যদি কোনও কট্টর মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল সমর্থক মনে করে থাকেন, মহমেডান একাশির লীগ খেতাব ভাঙিয়েই আবার বছর দশেক শূন্য হাতে চালিয়ে যাবে, তাহলে তিনি বিরাট ভুল করেছেন। মহমেডান এবারের সাফল্যকে যে ধরে রাখার সবরকম চেষ্টা করবে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মাইক ব্রিয়ারলি

রাজু মুখোপাধ্যায়

বিশ্বক্রিকেটে মাইকেল ব্রিয়ারলির খুব নামডাক। ইংল্যাণ্ড এবার যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট-সিরিজ জিতল, তাতে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন হিসাবে ব্রিয়ারলির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তোমরা যারা খেলাধুলোর খোঁজখবর রাখো, বিশেষ করে ক্রিকেটের, নিশ্চয়ই বিভিন্ন কাগজপত্রে তাঁর ছবি দেখেছ, তাঁর সম্বন্ধে লেখাও পড়েছ অনেক। কিন্তু ক্রিকেটার হিসেবে যিনি এত খ্যাতির অধিকারী, মানুষ হিসেবে তিনি কেমন? এর জবাব একটি শব্দেই দেওয়া যায়— অসাধারণ। মানুষ ব্রিয়ারলির সত্যিই কোনো তুলনা নেই।

আমার মনে পড়ছে ১৯৭৬ সালের কথা। পূর্বাঞ্চলের হয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলতে গিয়েছি গৌহাটি। খেলার দ্বিতীয় দিন দুপুরে খাবার টেবিলে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ পাশে-বসা মাইকেল ব্রিয়ারলি বলে উঠলেন, "ওয়েল প্লেড।" আমি মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানালুম। সেই আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

তারপর আমাদের বন্ধুত্ব যত নিবিড় হয়েছে, আমি তাঁর নানা গুণপনায় মুগ্ধ হয়েছি। অত বড় খেলোয়াড়, কোনো অহঙ্কার নেই। আচার আচরণ এত নম্র আর মার্জিত যে, না দেখলে তোমরা বিশ্বাসই করবে না। সব ব্যাপারেই মাইকের দারুণ উৎসাহ, কিন্তু কখনো তাঁকে উত্তেজিত হতে দেখিনি। উদ্ধত হতে দেখিনি।

মাইকের আর একটা মস্ত গুণ এই যে, তিনি তাঁর নিজের ভুলত্রুটি সম্বন্ধে সর্বদাই খুব সচেতন। নিজেকে তিনি একজন সাধারণ ব্যাটসম্যান ছাড়া বেশি কিছু মনে করেন না। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছি, ক্রিকেট সম্পর্কে মাইকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিস্তর, অথচ অপরের মতামতের খুব মূল্য দেন। কিন্তু কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার হলে তিনি নিজে যেটা ভাল বোঝেন, সেটাই করেন,

চুলের যত্নে আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না
পুরোপুরি নির্ভর করি বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিনের উপর

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল

অনবদ্য এই কেশতেলের প্রস্তুতকারক

বেঙ্গল কেমিক্যাল

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ

৬০ বছরের বেশি সময় ধরে একান্ত বিশ্বস্ত

গত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে যাঁরাই চুলের ব্যাপারে একটু যত্নশীল, তাঁরা প্রত্যেকেই ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করেছেন। তাদের এই বিশ্বাসই আমাকে এতো আস্থা যুগিয়েছে। চুলের ব্যাপারে আমি যেমনটি চাই, ক্যান্থারাইডিন আমাকে ঠিক সেগুলিই যোগান দেয়—এতে চুলের বাড়-বৃদ্ধি হয় দেখার মতো; চন্দনের মিষ্টি সুবাস থাকায় সারাদিন মনটা সতেজ থাকে এবং চুল এতটুকু চটচটে না হয়েও জেল্লা দেয় অনেক বেশি। চুলের পরিচর্যায় এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারি বলুন! আমি তো দেশের সবার পছন্দসই তেলটিই বেছে নিয়েছি।

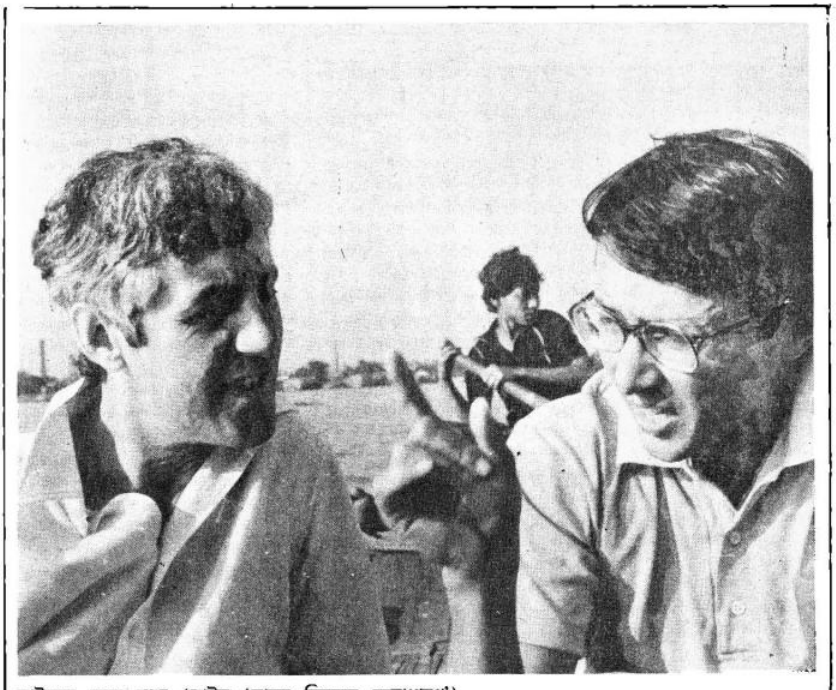

মাইকের সঙ্গে রাজু (মাইক 'মানুষ হিসেবে অসাধারণ')

সেখানে অন্য কারো পরামর্শ বা উপদেশকে বড়-একটা আমল দেন না।

১৯৭৭ সালে মাইক ইংল্যাণ্ড টেস্ট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তারপর থেকেই তাঁর দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। মাইক যদিও দলের সেরা খেলোয়াড় নন, তা সত্ত্বেও বিদ্যা-বুদ্ধি-ব্যক্তিত্ব আর বিচক্ষণতায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন।

মাইক ভারতবর্ষকে ভীষণ ভালবাসেন। ভারতের মানুষ, ভারতীয় রান্না, ভারতীয় পোশাক, ভারতীয় গানবাজনা— সবই তাঁর প্রিয়। বিদ্যাসাগরী চটির প্রতিও মাইকের খুব দুর্বলতা আছে।

মাইকেল ব্রিয়ারলির প্রিয় ভারতীয় খাদ্য কী জানো? মাছমাংস নয়, বিশুদ্ধ নিরামিষ খাবার— ঘি-ভাত, বেগুনের ভরতা, আলুর দম। তবে লাউচিংড়িও বেশ পছন্দ করেন। কিন্তু কন্টিনেন্টাল খাবারে মাইকের তেমন আগ্রহ দেখিনি। পানীয়র মধ্যে লস্যি আর চা তাঁর খুব প্রিয়।

কলকাতায় এসে মাইকেল ব্রিয়ারলি কিন্তু অন্য বিদেশী খেলোয়াড়দের মতো অভিজাত ক্লাবে আর পার্ক স্ট্রীটের রেস্টুরেণ্টে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাননি। চলে গেছেন সল্ট লেকের এস. ও. এস. ভিলেজ দেখতে। এখানে এসে অনাথ শিশুদের আদর করেছেন, কর্মকর্তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেছেন। সময় কাটাতে মাঝে-মাঝে গঙ্গায় নৌকো করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কলকাতা সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। শুয়ে বসে গল্প করে নয়, কলকাতার পথেঘাটে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে মাইক নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আর এখানে তিনি কারো সঙ্গেই খেলা নিয়ে তেমন গল্প করেননি— তাঁর যত গল্প সাধারণ মানুষকে নিয়ে। এঁরাই হয়তো তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়েছে।

এবার তোমরাই বলো, ব্রিয়ারলি মানুষ হিসেবে সত্যিই অসাধারণ কি না!

নিউট্রিন চকলেট এক্লেয়ার্স

নিউট্রিন চকলেট এক্লেয়ার্স
চকলেট একটি
মজাদার স্বাদ দুটি !

CAS/NC/52/81|BEN

উজ্জ্বল বয়কট

মণীশ মৌলিক

টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারী কে? উত্তর খুব সহজ—স্যার গারফিল্ড সোবার্স। তারপরেই রানসংগ্রহের কৃতিত্বের তালিকায় কার নাম রয়েছে? তেরোই আগস্ট সকাল পর্যন্ত এ-প্রশ্নের উত্তর ছিল, ইংল্যাণ্ডের মাইকেল কলিন কাউড্রে। কিন্তু ম্যানচেস্টারে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেস্টম্যাচের প্রথম দিনে খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রেকর্ডের খাতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রানাধিকারীর নাম পালটে যায়। কলিন কাউড্রের জায়গায় উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হয় কাউড্রেরই দেশের একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যাটসম্যানের— নাম জিওফ্রে বয়কট।

পঞ্চম টেস্ট শুরু হওয়ার আগে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ হিসেবে ইতিহাসে জায়গা পেতে বয়কটের আর সাত রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল। তাহলেই বয়কট কাউড্রের রানসংখ্যাকে (৭,৬২৪) টপকে যেতেন। পঞ্চম টেস্টের প্রথম দিনে অল্প সময়ের মধ্যেই চল্লিশোর্ধ্ব বয়কট সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যান। প্রথম ইনিংসে তিনি যখন আউট হন তখন তাঁর রান ছিল দশ। অর্থাৎ, তাঁর সংগ্রহে ছিল কুড়িটি শতরানসহ ৭,৬২৮ রান।

সোবার্স বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন ৯৩টি টেস্ট খেলার সুবাদে ২৬টি সেনচুরিসহ ৮,০৩২ রান করে। এই অবস্থায়, বয়কট সোবার্সের চেয়ে ৪০৪ রানে পেছিয়ে ছিলেন। তার মানে, আর ৪০৫ রান করতে পারলেই বয়কট সোবার্সের রেকর্ডকেও ম্লান করে দিতে পারবেন এবং তিনিই পাবেন টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারীর দুর্লভ সম্মান। পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বয়কট ৩৭ রান করেছেন। তাহলে সোবার্সের সঙ্গে তাঁর রানের ব্যবধান আরও কমে গেল। লক্ষ্যে পৌঁছতে বাকি রইল

৩৬৮ রান।

তোমরা যখন এই লেখা পড়বে তখন ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ টেস্ট হয়ে গেছে। আশা করব, ওই দুই ইনিংসে লক্ষ্যবিন্দুর আরও অনেক কাছে চলে যাবেন প্রবীণ ক্রিকেটার বয়কট। তারপরেই ভারত সফরের জন্য ইংল্যাণ্ড দল গড়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে যাবে। সফরকারী ইংল্যাণ্ড দলে নির্ভরযোগ্য বয়কট অবশ্যই থাকবেন। ভারতে ছটা টেস্ট খেলা হবে। তার মধ্যেই, আমার ভীষণভাবে মনে হচ্ছে, তার মধ্যেই ভারতের মাটিতে ক্রমশ ব্যবধান কমিয়ে ৮,০৩২ রানের বেড়া ভেঙে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়বেন ক্রিকেটের এক অনন্য প্রতিভা জিওফ্রে বয়কট।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX,78-1812 BG

॥ ২৯ ॥

টোকিও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হলেন আজিজ। সমর ব্যানার্জি এবং কিট্টু বাদ পড়লেন। আগেই বলেছি, দলের সহ-অধিনায়ক হলেন নিখিল নন্দী। কিন্তু দুঃখের কথা, নিখিলদা একটি ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি।

টোকিও রওনা হবার আগে ভারতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজার ওড়িশার ফেলু মহাপাত্র এক সংবাদপত্রে মন্তব্য করলেন, 'পি কে ব্যানার্জি গোল করতে পারলেই আমরা জিতব।' একজন বাইশ বছর বয়সী ফুটবলারের পক্ষে এই ধরনের প্রশংসা যে কত বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা কিছুটা হয়তো তোমরা বুঝবে।

এই প্রথম ভারতীয় দলে এলেন চুনী গোস্বামী। ট্রায়ালে চুনী রাইট ইনসাইড হিসেবে আমার পক্ষে থাকায় দু'জনের মধ্যে চমৎকার একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টোকিওয় পৌঁছে চুনী জানালেন, 'আমি রাইট ইনসাইডে খেলব না।'

তবে, এসব তো খেলার মাঠের সমস্যা। আগে বলি, প্রথম দর্শনেই জাপান কীভাবে আমাকে মুগ্ধ করল। জাপানের আর-এক নাম 'নিপ্পন' —সূর্য ওঠার দেশ। জাপানেরই হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পড়েছিল আণবিক বোমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল হানাডা বিমানবন্দর। সেসব তো পড়া এবং শোনা কথা। মাত্র তেরো বছর পর, মানে উনিশশো আটান্নয় নিজের চোখে দেখলাম, জাপান কীভাবে সব ক্ষয়ক্ষতি সামলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ম্যাগনেটিক ডোর, মেট্রো রেল—আরও কত কী দেখতে-দেখতে নতুন জাপানকে ভালবেসে ফেললাম।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল বিখ্যাত 'দাই-ইচি' হোটেলে। হোটেলের সামনেই বিশাল-বিশাল ব্যানার—'ওয়েলকাম টু টোকিও এশিয়াড'। কিমোনো পরা পুতুলের মতো দেখতে জাপানি তরুণীরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। 'কিমোনো' হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের ড্রেসিং গাউন।

ঢোকার আগেই বুঝেছিলাম, বিরাট হোটেল। কিন্তু ভিতরে ঢুকে চোখ, যাকে বলে, ছানাবড়া! হাজারখানেক ঘর, বিরাট প্যাসেজ। এই প্রথম 'এসক্যালেটর' দেখলাম।

আমাদের প্রথম খেলার দিন-পাঁচেক আগেই টোকিও পৌঁছেছি। প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা। লিমোজিন চড়ে সকলে যেতাম। গাড়িতে সবার জন্য হেডফোনের ব্যবস্থা, কানে দিলেই চমৎকার গান শোনা যেত। সাদা গ্লাভস-পরা ড্রাইভার খুব দ্রুতগতিতেই আমাদের মাঠে নিয়ে যেতেন।

প্র্যাকটিস কিন্তু রোজ একসময়ে হত না। এক-এক দিন এক-এক সময়ে দেড় ঘণ্টার জন্য আমাদের মাঠ দেওয়া হত। সবুজ ঘাসে ভরা সুন্দর মাঠ।

জাপানের দ্বিতীয় দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচে আমরা জিতলাম পরিষ্কার ছয় গোলে। চুনী রাইট ইনসাইডে খেলতে না চাওয়ায়, আমার পাশে রহমতুল্লা এলেন। বোঝাপড়া না থাকায় কিছুটা অসুবিধা হল। খুব-একটা ভাল খেলিনি। তিনটে গোল অবশ্য করলাম। আমাদের টীম ছিল এইরকমঃ থঙ্গরাজ, আজিজ, আমেদ হোসেন ও লতিফ, কেম্পিয়া ও নূর; পি কে ব্যানার্জি, রহমতুল্লা, দামোদরন, চুনী গোস্বামী ও বলরাম।

প্রধান স্টেডিয়ামে শুধু সেমি-ফাইনাল আর ফাইনাল খেলা হওয়ার কথা। সেই মাঠ তো অতি চমৎকার। কিন্তু আগের ম্যাচগুলো যে-মাঠে হবে, সেটি দেখার সুযোগ আমরা আগে পাইনি। প্রথম খেলার ঠিক আগের দিন মাঠে গিয়ে চক্ষুস্থির। গোটা মাঠে ঘাসের চাকলা বসানো। এই মাঠ তৈরি হতে আরও অন্তত

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু,
পুষ্টিকর

ব্রিটানিয়া
মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.MB.3-1812 BG

দেড় মাস লাগত। মাঠের যে অবস্থা দেখলাম, তাতে বল কন্‌ট্রোল করা কঠিন।

প্রথম ম্যাচ বার্মার বিরুদ্ধে। কাননের চোট ছিল। কিন্তু আরেক সেন্টার ফরোয়ার্ড দামোদরন ছিলেন ভিতু। প্র্যাকটিসের সময় শুধু পা বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। একদিন বললাম, "কী ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত আমাকেই সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলতে হবে নাকি?" দামোদরন লাজুক হেসে জবাব দিলেন, "না না, আসল সময়ে ঠিক খেলব।"

খেললেনও দারুণ। আমার সেন্টার থেকে চমৎকার গোল করলেন। বারবার ঝুঁকি নিলেন। কিন্তু খেলা একসময় ২—২ হয়ে গেল। খেলা শেষ হতে যখন মিনিট-পাঁচেক বাকি, বার্মার গোল থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ গজ দূরে আমরা একটা ফ্রী কিক পেলাম। সামনে ওদের ডিফেণ্ডারদের প্রাচীর, বল কাউকে পাস করে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দেখলাম, গোলকীপার ডান দিকে বেশি জায়গা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় দশ ফুট উঁচু জোরালো শট নিলাম। ডান পায়ের আউটসাইড সোয়ার্ভ। কিন্তু শটে খুব জোর থাকায় বল অনেক দেরিতে বাঁক নিল। বার্মার গোলকীপারের কিছু করার ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘামে আর বৃষ্টিতে ভিজে শিয়ালদহর ম্যানশন মাঠে এইরকম শট নেওয়া অভ্যাস করেছি। এই শটটি একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতকে জিতিয়ে দিল। ম্যানশন মাঠের কথা তো মনে পড়বেই, কী বলো?

আমার খেলা কিন্তু ভাল হল না। রহমতুল্লার সঙ্গে বোঝাপড়া হয়নি। তার উপর, আমার দিকের উইং হাফ কেম্পিয়া দুর্দান্ত বল স্ন্যাচার' হলেও গেমমেকার ছিলেন না। তাই গোটা মাঠে বেশ কিছুটা অর্থহীন ছুটোছুটি করে সময় কাটাতে হল।

পরের ম্যাচ হংকংয়ের সঙ্গে। পেশাদার ফুটবলারদের নিয়ে গড়া টীম। ওদের তালিম দিয়েছেন একজন ব্রিটিশ কোচ। কিন্তু চুনী আর দামোদরনের গোলে আমরা ভালভাবেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ওরা পরপর দুটো গোল শোধ করে দিল। এই অবস্থায় আমরা পেনালটি পেলাম। কে মারবে? তখন তো টাইব্রেকার ছিল না, কে পেনালটি মারবে আগে থেকে ঠিকও থাকত না। নুর পেনালটি শট বাইরে মারলেন।

অতিরিক্ত সময়ে অবশ্য আমরা সহজেই তিন গোল করে ম্যাচ জিতে গেলাম ৫—২ গোলে। শেষ গোলটি পেনালটি থেকে করলেন বলরাম।

এবার প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দোনেশিয়া, যারা চার বছর আগে ম্যানিলা এশিয়ান গেমসে ভারতকে ৪—১ গোলে হারিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার ফুটবলারদের তালিম দিয়েছিলেন একজন যুগোশ্লাভ কোচ।

খেলা শুরু হতেই বোঝা গেল 'ম্যান-টু-ম্যান মার্কিং' কাকে বলে। ওদের লেফট ব্যাক সবসময় আমার পায়ে-পায়ে ঘুরছেন। বিরক্ত হয়ে একবার সাইড লাইনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। লেফট ব্যাকও তাই করলেন! গোটা স্টেডিয়ামের দর্শকরা হাসির খোরাক পেলেন। যতবার বল ধরি, বাধা পাই। বেশ কয়েকবার ফাউল করেই লেফট ব্যাকটি নাটকীয় ভঙ্গিতে রেফারীর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেখা গেল, ক্ষমা করার ব্যাপারেও রেফারীর কোনো ক্লান্তি নেই।

একটা কর্নার কিক ঠিক ফার্স্ট বারের কাছে পড়ল। বলে স্যুইং ছিল। ইন্দোনেশিয়ার চারজন ফরোয়ার্ড ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কার পায়ে লেগে যে বল গোলে ঢুকল বোঝা গেল না। তবে ইন্দোনেশিয়া এক গোলে এগিয়ে গেল।

পরপর তিনদিন আমাদের ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। সবার শরীর চলছিল না। তবু দ্বিতীয়ার্ধে লড়াই জমল। বলরামের পাস থেকে গোল করে ১—১ করে দিলেন দামোদরন।

(ক্রমশ)

গোলমেলে গোল

'উইং থেকে গোল'-এর ২১ নম্বর কিস্তিতে পি. কে. লিখেছেন, মেলবোর্ন অলিম্পিকের বছরে চিনা জাতীয় দলের কাছে ৮—১ গোলে পরাজিত মোহনবাগানের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেন সেণ্টার হাফ সুভাষ সর্বাধিকারী। আমি কিন্তু জানি, গোলটি করেছিলেন লেফট-ইন সাত্তার। ঐদিন সুভাষ সর্বাধিকারী দলের হয়ে মাঠেই নামেননি। কেম্পিয়াকে সেদিন মোহনবাগান দলে খেলিয়ে পি. কে. আরেকটি ভুল করেছেন। আসলে কেম্পিয়া সে-বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলতেন।—পার্থপ্রতিম বসু, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা-৫।

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০০৮৪

HTC-GDP-3760

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা: গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক জর্দাপান খান। গবার ঘরে মাঝরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। হরিহর পাড়ুইয়ের খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত। তাকে ধরতে তাঁবুতে ঢুকে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। গোবিন্দ এক গ্রামে আশ্রয় নেয়। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পায়। কিন্তু গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধববাবুর বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলকে হাত করেছে ডাকাত সাতনা। কাকাতুয়ার সঙ্গে রামুকেও সে লুঠ করেছে। হরিহর যেখানে খুন হয়েছিল, গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাত্তিরে গবা সেই কাশিমের চরে গিয়ে সাংকেতিক গান গায়। কিছুক্ষণ বাদে মনে হয়, কারা যেন আসছে। তারপর...

॥ ২২ ॥

দুজনে নিঃসাড়ে বসে আছে। অপেক্ষা করছে। টের পাচ্ছে, আড়াল থেকে কেউ নজর করছে তাদের দিকে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও একদম সামনে কেউই এগিয়ে এল না।

"গবাদা।" গোবিন্দ ফিসফিস করে বলল।

"বলে ফ্যাল।"

"ওরা আমাদের মাপজোখ করছে। কাছে আসছে না।"

"তাই তো দেখছি। কিন্তু এই কুয়াশা আর অন্ধকারে মাপজোখটা করছে কীভাবে?"

"সেও তো কথা। আর আমরাই বা উজবুকের মতো লুকিয়ে আছি কেন? ওরা যে খুঁজে পাবে না আমাদের।" বলে গোবিন্দ উঠতে যাচ্ছিল।

গবা হাতটা টেনে ধরে বলল, "দূর পাগল। অতটা বেপরোয়া হোসনে। বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?"

"তুমি গানটা তাহলে আর একবার ধরো। দেখি ওরা জবাব দেয় কিনা।"

গবা গলা খাঁকারি দিয়ে গান ধরল, "দানাপানি খায় রে পক্ষী, উড়াল দিতে চায়। তার শিকল করে ঠিনিন ঠিনিন বেন্ধে রাখা দায়। এইবার উড়িলে পক্ষী আর না পাবে তারে। ধনরত্নের হদিস রবে চির অন্ধকারে। তাই শুন শুন বুদ্ধিমন্ত যতেক ভক্তজন। পাখিরে কওয়াতে কথা এসেছেন দুজন। অতি শিষ্ট শান্ত ভদ্র নখদন্ত নাই। দুধুভাতু খাই মোরা ধর্মেরে ডরাই।"

"গবাদা।" এবার বেশ একটু হেঁকেই ডাকল গোবিন্দ।

"বলে ফ্যাল।"

"কই, কারো তো টিকি দেখছি না।"

"এখনো বোধহয় মাপজোখ করছে।"

"দাঁড়াও। ওদিকে এক বাঁশঝাড়ের কাছে একটা ছায়া মতো দেখছি।" বলে গোবিন্দ উঠে দাঁড়াল।

সঙ্গে-সঙ্গে বাতাসে একটা মৃদু শিসের মতো শব্দ হল। অন্ধকারেও ঝিকিয়ে উঠল একটা বিদ্যুৎগতি বল্লম।

"বাপ রে।" বলে গোবিন্দ বসে পড়ল।

বল্লমটা খচ করে বসে গেল পিছনের একটা গাছে।

"জোর বেঁচে গেছিস।" গবা গোবিন্দকে কাঁটাঝোপ থেকে টেনে তুলতে তুলতে বলে।

"অন্ধকারেও নিশানা দেখেছ? এই টিপ যার-তার হাতের নয়।"

"বকবক করিসনি। এখন চল্, উঠে লম্বা দিই।"

গোবিন্দও কথাটায় সায় দিয়ে বলল, "তাই চলো। কিন্তু ওরা আমাদের বিশ্বাস করল না কেন বলো তো!"

"সেটাই বুদ্ধির কাজ।"

দুজনে জঙ্গলের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসতে থাকে।

জঙ্গলের বাইরে এসে গবা একটু হাঁফ ছেড়ে বলে, "আর যাহোক তাহোক, আমাদের গান

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি,
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !

পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।

OBM 6642 BN

ওদের কানে তো পৌঁছেছে। যদি কাজ হয় তো ওতেই হবে।"

"আমরা কারা তা জানবে কী করে?"

"খোঁজ নেবে। জানা কিছু শক্ত না। একটু বুদ্ধি চাই। সেটা ওদের ভালই আছে।"

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে গোবিন্দ জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু সাতনার দল আমাকে খড়ের গাদায় পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল কেন বলো তো!"

"সে আর বলা শক্ত কী? তোকে মারলে হরিহরের সত্যিকারের খুনি বেঁচে যাবে। তুই যে নির্দোষ তা আর প্রমাণ হবে না।"

"আমাকে হাতে পেলে কি ওরা মেরে ফেলবে গবাদা?"

"চেষ্টা তো করবেই।"

গোবিন্দ আর কিছু বলল না।

গবা বলল, "রামুটার কথা ভাবছি। কীভাবে রেখেছে ওকে কে জানে! উদ্ধববাবুকে শাসিয়ে গেছে, পাখিচুরির কথা পাঁচকান হলে রামুকে জ্যান্ত রাখবে না। তা সে-কথা তো দুনিয়া-সুদ্ধু লোক জেনে গেছে।"

এ-কথায় গোবিন্দ থমকে দাঁড়িয়ে গবার হাত চেপে ধরে বলল, "গবাদা, ফিরে যাই চলো। আমরা দুজন হলেও দশজনের মহড়া নিতে পারি। চলো গিয়ে ওদের ডেরা হুটোপাটা করে দিয়ে রামুকে নিয়ে আসি।"

গবা মাথা নেড়ে বলল, "দূর পাগল! ডেরায় ঢুকতেই পারবি না। শত্রুকে অত দুর্বল ভাবতে নেই। সাতনাও সার্কাসে ছিল, সেও গায়ে-গতরে কম নয়।"

"কিন্তু সাতনাকে যে বিশ্বাস নেই। নিজের মেয়েটা চুরি যাওয়ার পর থেকে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। পাগলাটে, খুনি। মায়াদয়া নেই আর ওর মধ্যে।"

গবা কী একটু ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "উদ্ধববাবু রামুকে খুব শাসন করেন বটে, কিন্তু আমি জানি, ওই দুষ্টু ছেলেটাই ওঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। যদি কোনো খারাপ খবর পান তাহলে আর বাঁচবেন না।"

"তাহলে?"

"তাহলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা চাই। সব কাজেই যে বুক চিতিয়ে বোকা-সাহস দেখাতে হবে তার কোনো মানে নেই। ছুঁচ হয়ে

ঢুকবি, বোমা হয়ে বেরোবি।"

"ঢুকতে দিচ্ছে কোথায়! যা একখানা বল্লম ঝেড়েছিল আজ।"

"রোস না দুদিন। পাখির মুখ থেকে তো আর আসল কথাটি বেরোচ্ছে না!"

* * *

কাশিমের চর নিঃঝুম। হাড়-কাঁপানো শীতে কুয়াশার কম্বল জড়িয়ে গোটা জায়গাটাই ঘুমিয়ে আছে যেন। মাঝে-মাঝে শেয়ালের ডাক আর প্যাঁচার ভুতুড়ে শব্দ ওঠে ঝোপেঝাড়ে। রাতপাখি ডেকে ওঠে হঠাৎ-হঠাৎ। বাঁশবনে ঝিঁঝির ঝিনঝিন। কিন্তু এইসব শব্দ যেন কাশিমের চরের নির্জনতাকেই আরো গাঢ় করে তোলে।

সুকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যে
একাই এক প্রতিষ্ঠান

সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যে একাই এক প্রতিষ্ঠান। এক এবং অনন্য। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় রচনা ও ছবির বিপুলায়তন সংগ্রহ 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র' যে-কোনও বয়সী পাঠকই অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করবেন অমূল্য এই সংগ্রহ নিজস্ব ভাণ্ডারে রাখতে। দু-খণ্ড বেরিয়েছে, তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। সম্পাদনা করেছেন সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু। সুকুমার রায়ের সমগ্র শিশু-সাহিত্য আবার আলাদাভাবে অতি সুলভ মূল্যে একটি মাত্র খণ্ডেও পাওয়া যায়। আরেকটি অভিনব সংকলন—'জীবজন্তু', আমাদের চারপাশের জানা-অজানা জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে নানান তথ্যে ভরা বই।

সুকুমার রায়ের বই

সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম খণ্ড ২৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০ সমগ্র শিশু সাহিত্য ১০·০০

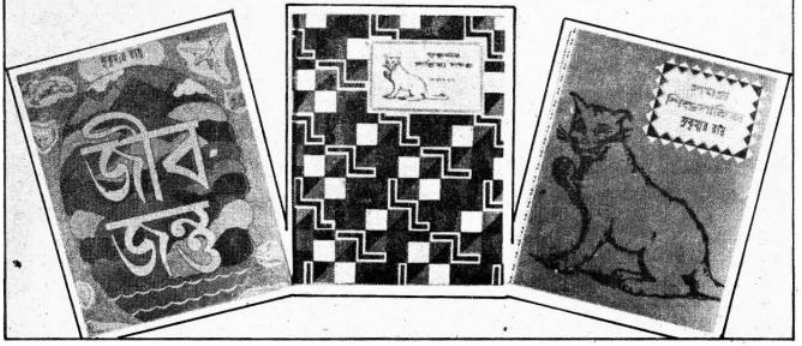

আরো অনেক বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছেলেদের বিবেকানন্দ ৬·০০ সরলাবালা সরকারের পিনকুর ডাইরি ৩·০০ মৌমাছির (বিমল ঘোষ) রাজার রাজা ৭·০০ শৈলেন ঘোষের অরুণ বরুণ কিরণমালা ৪·০০ মিতুল নামে পুতুলটি ৬·০০ ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৭·০০, বাজনা ৬·০০ হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৬·০০ আমার নাম টায়রা ৬·০০ আজব বাঘের আজগুবি ৭·০০ জাদুর দেশে জগন্নাথ ৮·০০ স্বপ্নের জাদুকরী ৭·০০ শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আমাদের নিবেদিতা ৬·০০ ঘনাদার ফুঁ ৭·০০ তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০ ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

দোতলার একটা ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে মেঝের ওপর চটের বিছানায় রামু শুয়ে আছে। গায়ে একটা কুটকুটে কম্বল, এরকম শুয়ে তার অভ্যাস নেই। মেঝে থেকে চট ভেদ করে পাথুরে ঠাণ্ডা আসছে। কুটকুটে কম্বল দিয়ে ঢুকছে বাইরের শীত। বারবার তাই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রামুর। দুষ্টুমি করতে গিয়ে সে বহুবার বহুরকম বিপদে পড়েছে। দুষ্টু ছেলেরা পড়েই। কিন্তু এ-রকম বিপদে সে কোনো কালে পড়েনি।

ডাকাতদের এই দলটা বেশ বড়-সড়। চেহারাগুলো একদম ভদ্রলোকের মতো নয়। হাতে সবসময়ে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি, বন্দুক টন্দুকও আছে। কারো কোনো মায়াদয়া নেই। খেলার মাঠ থেকে ফেরার সময় সন্ধেবেলা হঠাৎ এসে খবর দিল, "তোমার বাবাকে কারা যেন পূর্বস্থলির মাঠে মারধোর করে ফেলে রেখে গেছে। শিগগির এসো।"

খবরটা পেয়েই রামু লোকটার পিছু-পিছু ছুটল। ক'দিন আগেই উদ্ধববাবুকে আদালত থেকে ফেরার পথে কারা বোমা মেরেছিল। এই সেদিনও বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। সুতরাং লোকটার কথায় রামুর অবিশ্বাস হয়নি। উদ্ধববাবুকে ওরা মারতেও পারে।

পূর্বস্থলির মাঠ শহরের বাইরে। ভারী নির্জন জায়গা। সাঁঝের আবছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। রামু সেখানে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকানোরও সময় পেল না। শিমুল গাছের পেছন থেকে জনাচারেক লোক বেরিয়ে এসে একটা গামছায় তার মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর একটা গোরুর গাড়িতে তুলে ফেলল চটপট। অনেক রাতে তারা এসে পৌঁছয় এই জায়গায়। রামু পরে ওদের কথাবার্তা থেকে জানতে পেরেছে এই জায়গারই নাম কাশিমের চর।

প্রথম রাত্রিটা সারাক্ষণ বাড়ির কথা ভেবে কেঁদেছে রামু। এরা রুটি আর একটা আলুর ঝোল খেতে দিয়েছিল। তা ছোঁয়ওনি সে। কিন্তু সকাল থেকে রামুর চোখের জল শুকিয়ে গেল। একটা দৈত্যের মতো লম্বাচওড়া লোক এসে তাকে প্রথমেই বলল, "শোনো রামু, তোমার বাবা বোকা বলেই আজ তোমার এই দশা। উদ্ধব-উকিল বোকাও বটে, জেদিও বটে। কিন্তু সে জানে না, আমার সঙ্গে বিবাদ করলে তাকে নির্বংশ হতে হবে। সে-কাজ শুরু হবে তোমাকে দিয়েই। একটু যদি বেচাল দেখি তবে রামদা দিয়ে দুখানা করে কেটে ফেলব। এখন যা-যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিকঠাক জবাব দাও। প্রথমে বলো, গবা পাগলা আসলে কে!"

রামু ভয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে বলল, "গবাদা তো পাগল।"

"ওর পাগলামিটা চালাকি ছাড়া কিছুই নয়। সেটা আমরা জানি। কিন্তু ওর আসল পরিচয়টা আমাদের দরকার।"

"গবাদা কারো কোনো ক্ষতি করে না তো।"

"ক্ষতি যাতে করতে না পারে তার জন্য সাবধান হওয়া ভাল।"-

"গবাদার আর কোনো পরিচয় আমি জানি না।"

লোকটা অবশ্য রামুকে এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করেনি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার লোকটা এল। কিন্তু তার সঙ্গে নয়নকাজলকে দেখে রামু হাঁ। সে চেঁচিয়ে উঠল, "নয়নদা!" কিন্তু সঙ্গের লোকটা রামুকে একটা ধমক মেরে বলল, "চোপ!" রামু ভয়ে চুপ করে গেল! নয়নকাজলও রামুর দিকে ভাল করে চাইতে পারছিল না। অন্য দিকে চেয়ে রইল। তার হাতে রামুদের কাকাতুয়ার দাঁড়টা।

দৈত্য লোকটা বলল, "এই পাখিটা কিছু গোপন খবর জানে। কিন্তু কিছুতেই বলছে না। তোমাদের পোষা পাখি, তোমরা নিশ্চয়ই ওর গোপন কথা জানো!"

রামু মাথা নেড়ে বলল, "জানি না। পাখিটা গুপ্তধনের কথা বলে বটে, কিন্তু কোথায় তা আছে তা কখনো বলেনি।"

লোকটা বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তোমার কাজ হল পাখিটার পেট থেকে কথা বের করা। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। যদি তার মধ্যে পারো ভাল, যদি না পারো তবে পাঁচ ঘা করে বেত খাবে রোজ। এই নয়নকাজলও থাকবে পাশের ঘরে। সে নজর রাখবে তুমি কী করছ না-করছ।"

রামু আর নিজেকে সামলাতে না-পেরে জোরে চেঁচিয়ে উঠল, "নয়নদা! তুমিও এদের দলে?"

নয়নকাজল তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

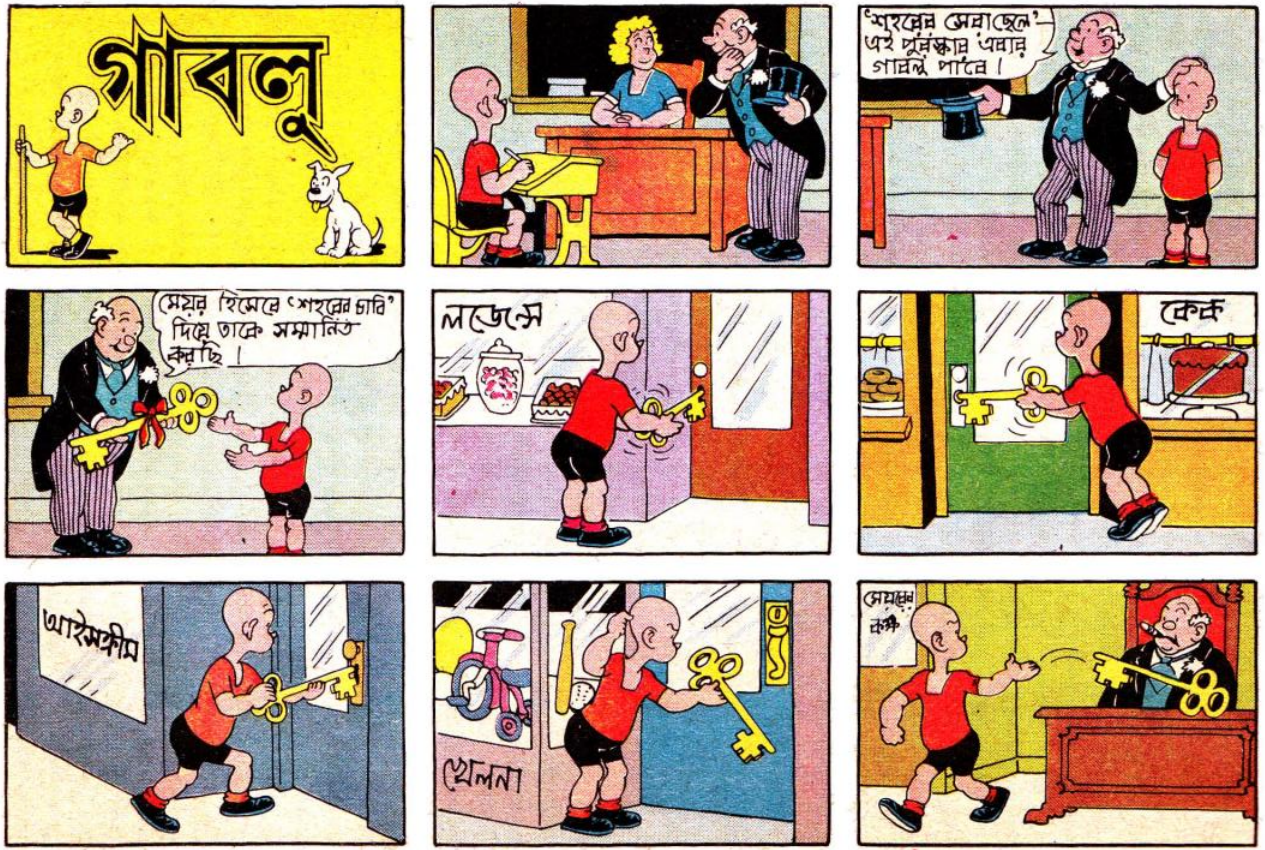

গাবলু
'শহরের সেরা ছেলে' এই পুরস্কার এবার গাবলু পাবে।
মেয়র হিসেবে 'শহরের চাবি' দিয়ে তাকে সম্মানিত করছি।
লজেন্স
কেক
আইসক্রীম
খেলনা
মেয়রের কক্ষ

অজগর আসছে তেড়ে

বাচস্পতি

তিন্নির আরো খানিকটা কথাবার্তা সকালে রেকর্ড করলেন হিগিনকাকু। ঐ বেশির ভাগই 'দাদ্-দা, আ-দ্দা, গা-গা' আওয়াজ। ভণ্টুকে আজ হিগিনকাকু টেপরেকর্ডার চালাতে আর রেকর্ড করতে শিখিয়ে দিয়েছেন, এতে তার মনে দারুণ আনন্দ। বাবা সাত-সকালে বাজারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভাই হিগিনবথাম চাইনিজ খেতে চেয়েছেন বলে পার্কসার্কাসের বাজার থেকে পর্ক (শুয়োরের মাংস), গড়িয়াহাট থেকে কচি বাঁশের অঙ্কুর, সিমলাই মির্চ ইত্যাদি সব বাজার করে গলদ্ঘর্ম হয়ে ফিরলেন। চানটান করে একেবারে ফরসা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসবার ঘরে চলে এলেন তারপর। হিগিনকাকু তখন ভণ্টুকে বোঝাচ্ছেন, বাংলায় সাতটা স্বরধ্বনি, কিন্তু তিন্নির তা শিখতে অন্তত দু-আড়াই বছর লাগবে। প্রথম দিকে পৃথিবীর সমস্ত শিশুরাই 'আ' স্বরধ্বনিটা মাত্র বলতে পারে।

"কেন কাকু?" ভণ্টু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"তার একটা বড় কারণ," হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "আ' বলতে পরিশ্রম সবচেয়ে কম। জিভের পরিশ্রমের হিসেবটাই দ্যাখ-না। অন্য সব স্বরধ্বনির বেলায় তাকে যে-দিকেই হোক, একটু নড়াচড়া করতে হচ্ছে। কিন্তু 'আ' বলবার সময় সে সামনে এগোচ্ছে না, পেছনে পিছোচ্ছে না, ওপরে উঠছে না। মুখটা শুধু হাঁ করতে হচ্ছে। সে তো কান্নার সময়েই শিশুর বেশ প্র্যাকটিস করা হয়ে যায়।"

বাবা হঠাৎ বাধা দিলেন। বললেন, "হিগিন, সেদিন তুই আমার উচ্চারণের ভুল ধরছিলি, বলছিলি আমি 'ওভ্যাস' না বলে 'অভ্যাস' বলি, আবার 'অব্যাহত' না বলে বলি 'ওব্যাহত'। গণ্ডগোলটা হচ্ছে 'অ' নিয়ে। বানানে 'অ' আছে কিন্তু উচ্চারণে কোথাও কোথাও হচ্ছে 'ও', তাই তো।"

হিগিনকাকু বললেন, "এই বানানে 'অ' কোথায় হচ্ছে সে-বিষয়ে একটু খেয়াল রেখো। কোথাও 'অ' তো পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে, যেমন 'অত', 'অব্যাহত', 'অশনি'। আবার কোথাও 'অ' বর্ণটা চেহারা দেখাচ্ছে না, কিন্তু উচ্চারণে 'অ' আছে— যেমন কলম। এটা আসলে ক্+অ+ল্+অ+ম্"।

ভণ্টু বলল, "বাঃ, উচ্চারণে আছে, অথচ বানানে নেই কেন?"

হিগিনকাকু বললেন, "সে অনেক কথা। তবে লিখতে গেলে কী সুবিধে হয় সেটাও লক্ষ করো। একটা চিহ্ন লিখছি 'ক', কিন্তু সেটা বোঝাচ্ছে 'ক্+অ'। 'অ' লেখার পরিশ্রমটা বেঁচে যাচ্ছে।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, খণ্ড-ত, অনুস্বার ইত্যাদি ছাড়া আর যে-কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ লিখলেই বোঝাবে তার সঙ্গে 'অ' আছে। 'খ' যেমন 'খ্+অ', তাই না?"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই 'অ'-এর নাম 'ইনহেরেন্ট ভাওয়েল' বা 'নিহিত স্বর'।

"কিন্তু এই 'অ'-কে নিয়েই তো খুব ঝামেলা।" বাবা বলে উঠলেন। "ধরো আমি বাংলা জানি না । বানান দেখে কোথায় 'অ' হবে, কোথায় হবে 'ও', তা কী করে বুঝব?"

"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কী বলিস ভণ্টু, তাহলে 'অ' দিয়েই আমাদের উচ্চারণের খেলা শুরু হোক, কেমন?"

ভণ্টু উৎসাহে ঘাড় নেড়ে জানাল, ঠিক হ্যায়। (ক্রমশ)

দুই বন্ধুতে

প্রসাদ

আজ সকাল থেকে চম্বল খুব ব্যস্ত। মাকেও ব্যস্ত করে তুলছে। ঘন-ঘন ঘড়ি দেখছে আর মাকে বলছে, "বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে, মা। কখন খাবার তৈরি হবে? সাড়ে আটটা তো বাজল।"

It's Sunday, but Mummy is busy.

Chambal has had his breakfast and now he's impatiently waiting for Mummy to pack his lunch.

He and his friend Rafique are to go for a bicycle trip.

They've planned to go as far as a kilometre or two beyond Thakurpukur.

Rafique's uncle has a bungalow there with a beautiful garden and a pond.

He spends his weekends there.

During the rest of the week it is vacant except for a mali.

So Rafique had suggested Chambal and he should spend a holiday at the bungalow when his uncle would be there.

This was to be the day.

But suddenly it seemed there was a hitch.

Rafique's uncle was taken ill.

So he had to cancel his visit to the bungalow this weekend.

Rafique sounded so disappointed when he rang up last evening.

"We could still go," he said, "you and I. But there will be nothing for us to eat in the place. Uncle takes his own cook along."

তখন চম্বলের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। "আমাদের খাবার আমরা সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো পারি।"

So, it was all arranged on the phone.

The friends are to start early.

Their first halt is to be at Sakherbazar.

They are not to halt there for more than fifteen minutes.

They are to reach the bungalow before the sun gets too hot.

They are to get home not later than five o'clock.

"And you are to observe every rule of the road and never to hurry," Mummy has said.

"How many times am I to tell you, Mummy, that I know the rules by heart and never break them?"

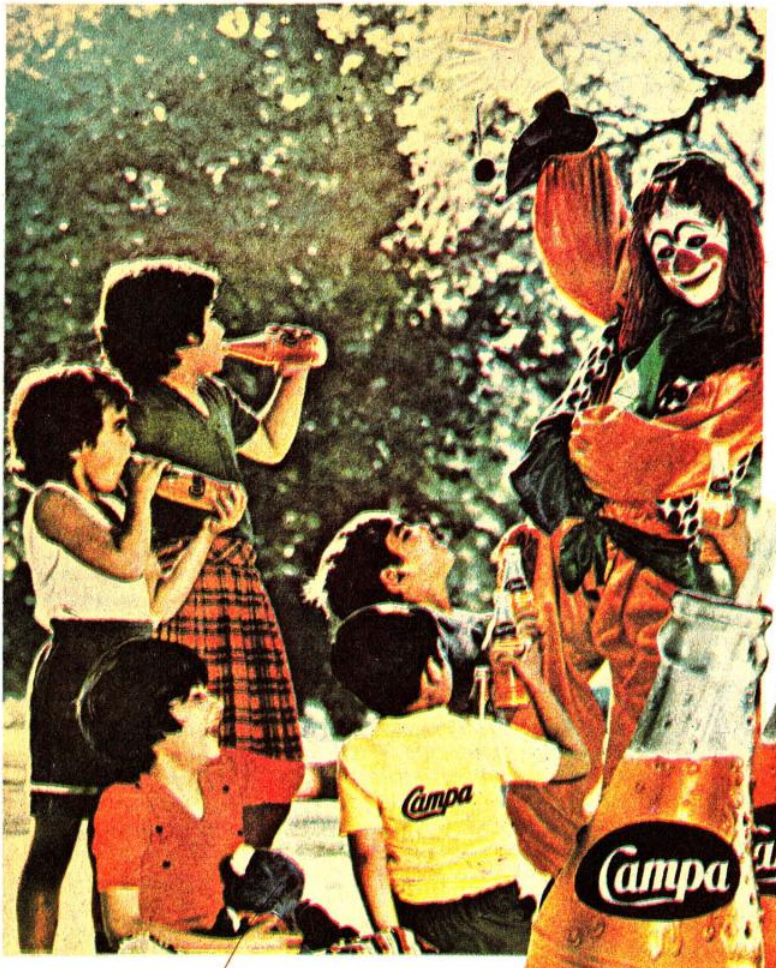

Campa
Campa
Campa
CONTENTS 200 ML
ক্যাম্পার সঙ্গে
আমরা মাতি রঙ্গে
স্বাদে ও আনন্দে!
ক্যাম্পা অরেঞ্জ ফ্লেবার - স্বাদে ও আনন্দে !
OBM/5361

বাঘা

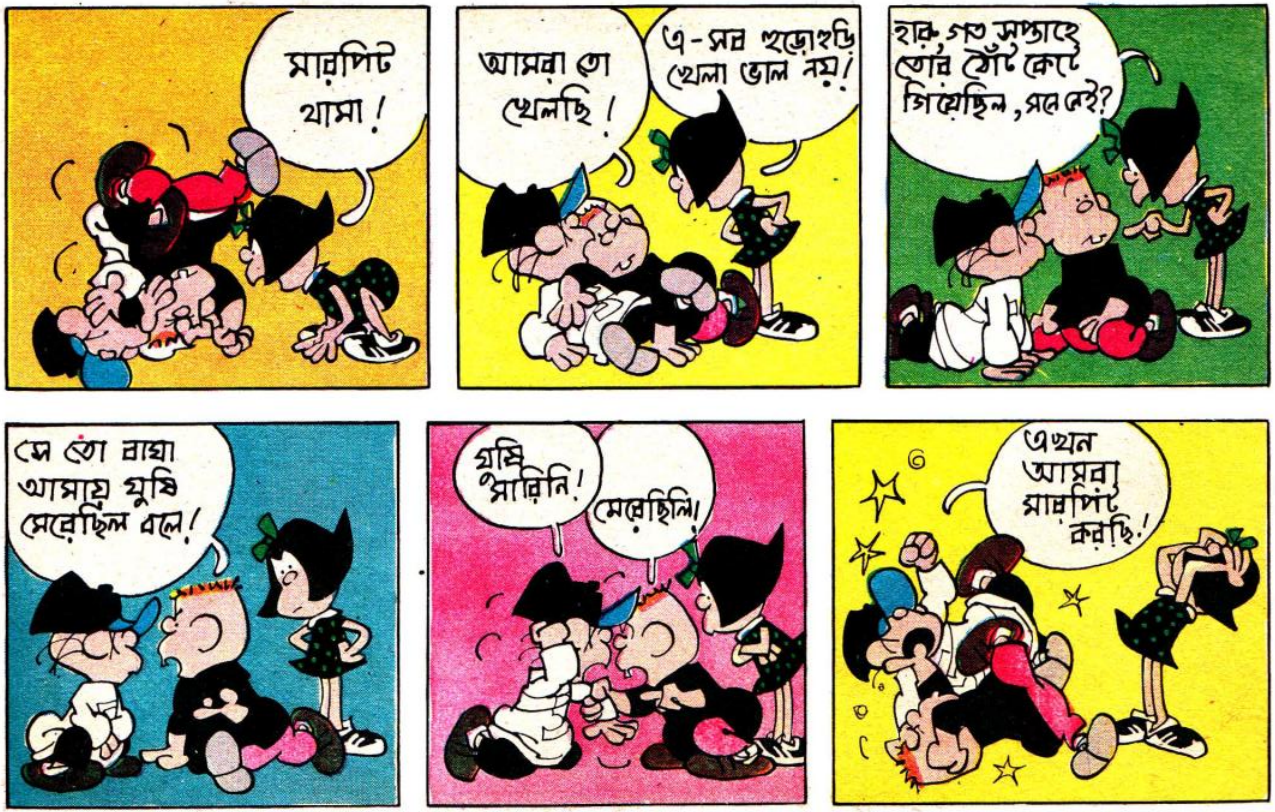

মারপিট থামা!
আমরা তো খেলছি!
এ-সব হুড়োহুড়ি খেলা ভাল নয়!
হারু, গত সপ্তাহে তোর ঠোঁট কেটে গিয়েছিল, মনে নেই?
সে তো বাঘা আমায় ঘুষি মেরেছিল বলে!
ঘুষি মারিনি!
মেরেছিলি!
এখন আমরা মারপিট করছি!

ডিম থেকে পাখি

গোটা ডিমকে মাঝখানে ভাগ করে পাখি শরীর আর পাখা একসঙ্গেই পাচ্ছে। এখন এই পাখাকে এদিক-ওদিক নড়ন-চড়ন করানোর কাজ তোমাদের। দ্যাখো-না চেষ্টা করে!

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

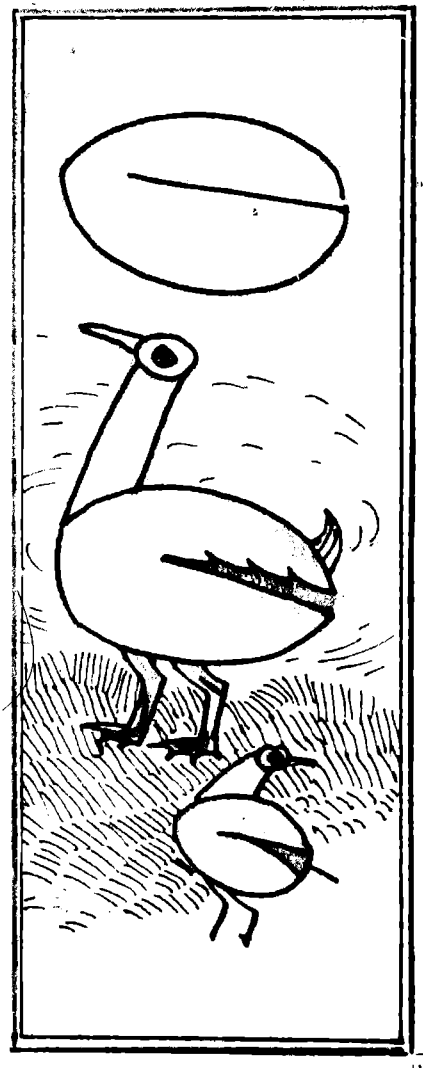

কার্ড বোর্ডের কাজ : গোল পলতোলা পাত্র

যতটা বড় পাত্র দরকার সেইমতো বোর্ডে একটা গোল দাগ দিয়ে তার পর আর একটা দাগ দিয়ে নেবে যতটা উঁচু রাখতে চাও সেইমতো। (ক নমুনা লক্ষ করো)

মাপের প্রথম গোলটির মধ্যে সমান ছ'কোণের একটি আকার করে (২নং ছবি) সেই আকারের বাহুগুলোকে দ্বিতীয় গোল পর্যন্ত টেনে নিলে যে ছ'টি ত্রিভুজ তৈরি হবে (১নং ছবি) তাকে মাঝামাঝি ভাগ করে নিয়ে ডান পাশের অংশটুকু (কালো) কেটে বাদ দিয়ে ফ্যালো। ফোঁটা-ফোঁটা দাগ-বরাবর ভাঁজ দিয়ে একে অপরের সঙ্গে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেই পলতোলা পাত্র তোমার হাতে।

জেনে রাখো—(১) কাজের শেষে ক্রাইলিন রঙ দিয়ে নকশা-কাজ করলে দেখতে বাহারি হবে। (২) পাত্রের আকার তোমার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে, তবে মাপ আর পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে কাজ নোংরা হবার সম্ভাবনা।

—কারিগর

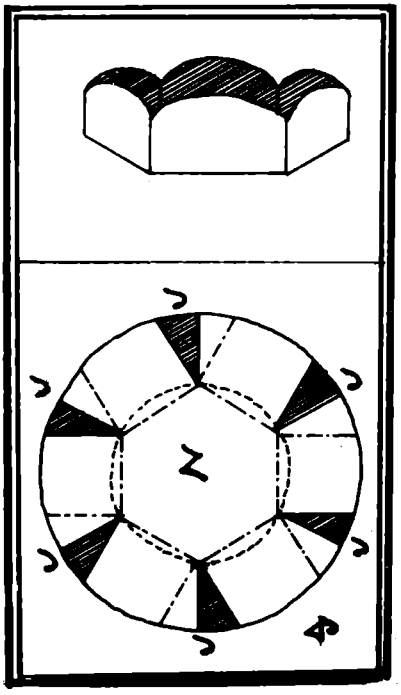

"১০ জনের মধ্যে
৭ জন স্কুলের
বাচ্চার দাঁতে গর্ত হয়"

—বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ, মার্চ ১৯৭৮
ইণ্ডিয়ান ডেণ্টাল অ্যাসোসিয়েশন

দাঁতের ব্যথা হল দন্ত-ক্ষয়ের একটি লক্ষণ। আপনার মুখের ভেতরের জীবাণু খাবারের কুচিগুলিকে ক্ষতিকর অ্যাসিডে পরিণত করে,-যা দাঁত আক্রমণ ক'রে তাতে যন্ত্রণাদায়ক গর্ত সৃষ্টি করে।

আনুন ফ্লোরাইড যুক্ত সিগন্যাল 2 দাঁতের গর্তরোধক

ফ্লোরাইডযুক্ত সিগন্যাল 2 দন্ত-ক্ষয় রোধ করে, দুভাবে: মুখের ভেতরের জীবাণুকে দাঁতের গর্তসৃষ্টিকারী অ্যাসিড তৈরী করতে দেয় না; আর সত্যিসত্যিই দাঁতের এনামেলে মিশে গিয়ে দাঁত মজবুত করে, দাঁতে গর্ত হওয়া নিবারণ করে। কারণ, দাঁতের গর্ত রোধের বিশেষ উপাদান, ফ্লোরাইড—সিগন্যালের অদ্বিতীয় ফর্মুলায় সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। এখন—বেশী দেরী হয়ে যাবার আগেই আনুন, সিগন্যাল 2 দাঁতের গর্তরোধক

অন্য কোনো টুথপেস্ট এর চেয়ে ভালোভাবে দাঁতের গর্ত রোধ করতে পারে না।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS-SG2-23-1812 BG

জীবন ও হনুর আরো জ্ঞান সঞ্চয়
নোবেল পুরস্কারের পায় পরিচয়
নোবেল ফাউণ্ডেশন বিখ্যাত সুইডিস রাসায়নিক ও ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। প্রত্যেক বছর এর তহবিল থেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শারীরবৃত্তি, সাহিত্য, শান্তি এবং অর্থবিদ্যা সম্পর্কে যাঁরা অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তাঁদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর প্রধান কার্য্যালয় হ'ল স্টকহোম সহরে। ১৯৭৮ সালে প্রত্যেক বিভাগে পুরস্কারের পরিমাণ ছিল ১৬১০০০ ডলার — এটি এক রেকর্ড।
মেরী কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪) হলেন একমাত্র মহিলা যিনি দু'বার ওই পুরস্কার অর্জনের গৌরব অর্জন করেন — ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান বিচ্ছিন্ন করার জন্য, এবং ১৯১১ সালে রসায়ন বিদ্যায়, রেডিয়াম ও পোলোনিয়ম আবিষ্কার করার জন্য।
অনেক বিখ্যাত ভারতীয় নোবেল পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন। ১৯৩০ সালে ডঃ সি. ভি. রমন পদার্থবিদ্যায় এই পুরস্কার লাভ করেন। তিনি আলো ও উপাদানের মধ্যে শক্তির বিনিময় বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এটি "রমন এফেক্ট" নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ১৯১৩ সালে সাহিত্যে এই পুরস্কার লাভ করেন, তাঁর রচিত কাব্য 'গীতাঞ্জলি'র জন্য। আর একজন বিখ্যাত ভারতীয় পুরস্কার বিজেতা হলেন মাদার টেরেসা যার জন্মস্থান যুগোশ্লোভিয়ায়। ১৯৭৮ সালে তিনি বিশ্বশান্তির জন্য এই পুরস্কার লাভ করেন।
প্রতিষ্ঠান হিসাবে ৩ বার (১৯০৭, ১৯৪৪ এবং ১৯৬৩) নোবেল পুরস্কার লাভ করে ইন্টারন্যাশনাল রেড ক্রস। যুদ্ধের সময় এঁদের প্রাথমিক কাজ হ'ল আহতদের শুশ্রূষা। অন্য সময় এঁদের কাজ হল প্রাথমিক চিকিৎসা, রক্তদান ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং অন্যান্য লোকহিতকর কাজ।
জীবন বীমা আপনার ভবিষ্যতের সুরক্ষার সবচেয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ উপায়। এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম
এরপর জীবন ও হনুর চমৎকার সব খেলাধূলার বিষয়ে অভিজ্ঞতা।
daCunha-LIC-114 BN.